কৃষণ চন্দর

এক বেশ্যার চিঠি

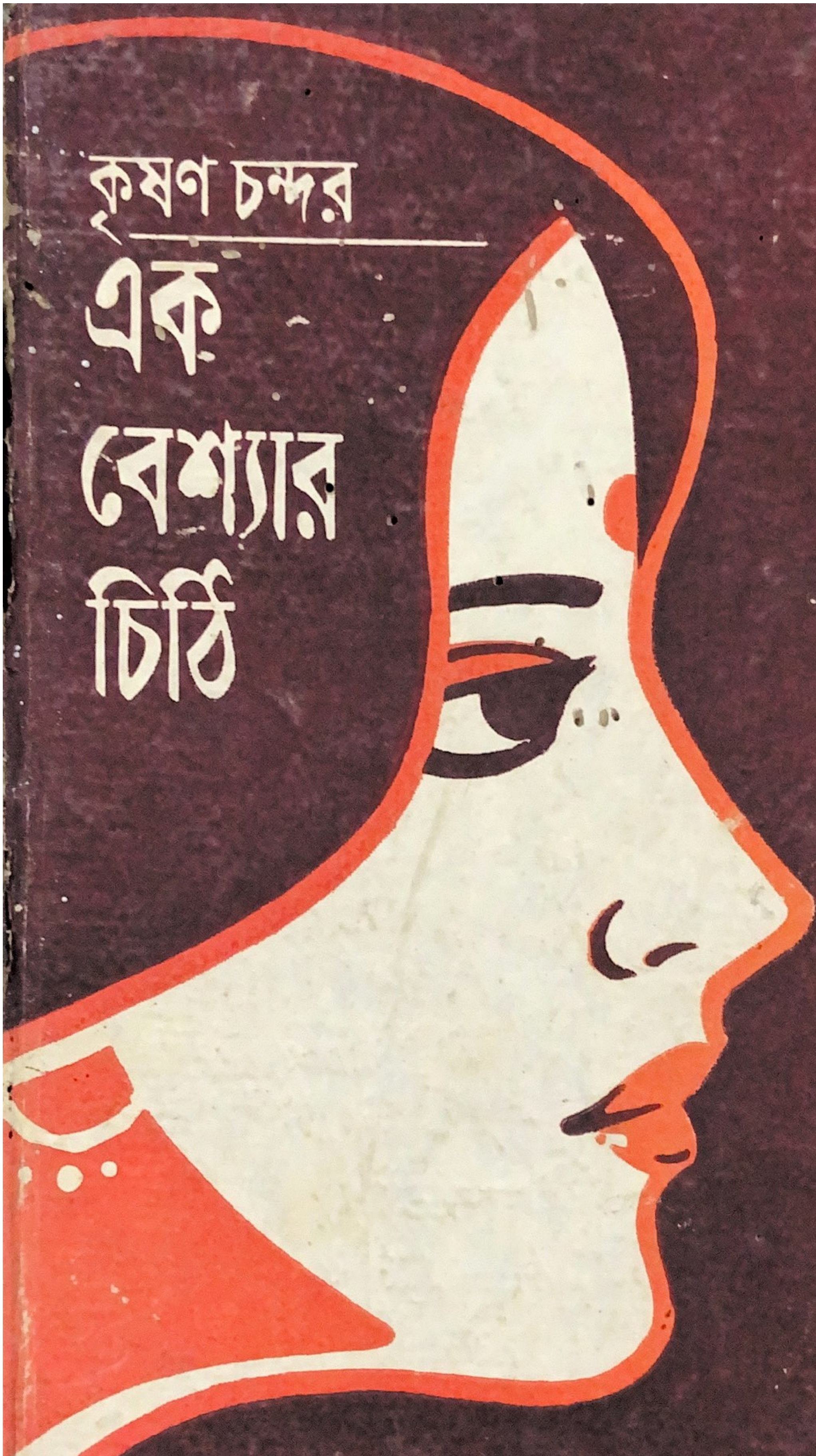

এক বেশ্যার চিঠি

কৃষণ চন্দর

ভাবানুবাদ :

নেপাল ভৌমিক

আগামী প্রকাশনী
৩৬ বাংলাবাজার ঢাকা-১

প্রকাশকাল :
জুলাই, ১৯৮৬

অনুবাদক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক :
কামরুন্‌নেসা নার্গিস
৩২ পাতলাখান লেন
ঢাকা—১

প্রচ্ছদ :
সুখেন দাস

মুদ্রণে :
স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স
৫২ লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা—১

মূল্য : ১২·০০ টাকা

কেবল এক উর্দু সাহিত্যেই নয় বরং যদি বলি গোটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একজন উর্দু লেখক, তা হ'লে মোটেই অত্যুক্তি বলা হবে না। তাঁর প্রতিটি রচনাই এমন যার ধ্বংস নেই; মৃত্যুহীন, অমর—এহেন ব্যক্তি সম্বন্ধে তখন থেকেই আমার ওপরের ধারণায় আমি অটল-অনড়। কেননা আনদাতা'র প্রথম সংস্করণের সঙ্গে সঙ্গেই যখন আমি লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত তাঁরই জনৈক হিন্দুস্থানী প্রকাশক লেখক বন্ধু সৈয়দ শফী হায়দার কাওসারের বুক ডিপোতে বসে দ্রুত অনুবাদ করে যাচ্ছিলাম, তখন আমায় 'অন্নদাতা'র সুবিধের জন্যে স্বয়ং কাহিনীকারও আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছায়ার মত ছিলেন—তখনো পাকিস্তান কায়েম হয়নি।

আবার যখন আমার এক বোনের বান্ধবীর সম্পর্কে ছোট ভাই'র মর্যদাপ্রাপ্ত চিত্র সাংবাদিকতার একচ্ছত্র আধিপত্যের অধিকারী সাপ্তাহিক চিত্রালী সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ 'তার একটি উদ্দেশ্য নিয়ে' আন্‌দাতা'র লেখকের স্বহস্থ লিখিত ৬৩ পৃষ্ঠায় 'শয়তানকা ইস্‌তিফা'র পাণ্ডুলিপির অনুবাদ 'শয়তানের পদত্যাগ' ১৯৬৮'র ৪ঠা অক্টোবরের 'চিত্রালী'তে ছেপে দিলে; তারপরেই দীর্ঘ দিনের জন্যে 'মৌলিক রচনার অভিযোগে' আমি হ'য়ে গেলাম পুতুল রাজার কোপ দৃষ্টির কুপে নিক্ষিপ্ত—তখনো বাংলাদেশ ছিল না।

আজো আমি তাঁর সম্বন্ধে আগের সে মন্তব্যেই অটল-অনড়। বর্তমানে তো আছেই ভবিষ্যতেও আমি বলবো এবং বলে যাবো কৃষণ চন্দর একটি অবিস্মরণীয় নামের তুলনাবিহীন প্রতিভা। তাঁর রচনার অনুবাদ নিয়ে আমার ব্যক্তিগত মন্তব্য হচ্ছে - সৎ উদ্দেশ্যে যদি কেউ ব্যবসায় নাবে তা হলে ভুতেও টাকা জুগিয়ে দেয়।

—ব'নজীর আহমদ

কৃষণ চন্দর এর কয়েকটি বইঃ

১. ভগবান ও শয়তান
২. দেবতার প্রতিমূর্তি
৩. এক বেশ্যার চিঠি
৪. একটি এক্সট্রা মেয়ে
৫. বিশ্বাসঘাতক
৬. স্বপ্নমিছিল

।। এক বেশ্যার চিঠি ।।

আমার বিশ্বাস. এর আগে আপনি কোন বেশ্যার চিঠি পাননি। আমার দৃঢ় ধারণা, আপনি আমার বা আমার পেশায় যারা রয়েছেন, সেইসব মেয়েমানুষের মুখও পর্যন্ত কোনদিন দেখেন নি। আমি জানি আপনার কাছে এই চিঠি লেখা কত গর্হিত—বিশেষ করে এমন এক খোলা চিঠি। কিন্তু কি করব, অবস্থা এমনই যে এ দুটি মেয়ের জন্য আমি যে তীব্র তাগাদা অনুভব করছি, আর তাই আপনাকে এ চিঠি না লিখে উপায় নেই।

এ চিঠি আমি লিখছি না। বেলা আর পুতুল আমাকে দিয়ে এই চিঠি লেখাচ্ছে সেজন্য আমাকে মাপ করবেন। আমি এক বেশ্যা মেয়ে মানুষ আপনাকে অকপটে এই চিঠি লিখছি— সেজন্য সাচ্চা হৃদয়ে আমি আপনার কাছে মাপ চেয়ে নিচ্ছি। আমার চিঠির যদি কোন বক্তব্য আপনার পছন্দ না হয় তার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন, কারণ বাধ্য হয়ে আমি এইসব লিখছি।

বেলা আর বুতুল আমাকে দিয়ে কেন চিঠি লেখাচ্ছে—আর ওদের এত কঠোর তাগাদাই বা কেন তা বলার আগে আমার নিজের সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলতে চাই। ঘাবড়াবেন না, আমি আমার ক্লেদাক্ত জীবনের ইতিহাস বলতে চাইছি না। বলতে চাইছি না কবে কেমন করে আমি পতিতা হই। ভালো মানুষীর দোহাই দিয়ে আমি আপনার কাছে কোন মিথ্যা করুণার প্রত্যাশী হয়ে এই আর্জি পেশ করতে আসিনি। আমি আপনার দরদী হৃদয়ের কথা জেনে নিজের সাফাই গাইতে কোন মিথ্যা কাহিনীর অবতারণাও করছি না। এই চিঠি লেখার উদ্দেশ্য এই নয়, আমি আপনার কাছে পতিতা জীবনের রহস্য এবং গোপনীয়তা তুলে ধরব। আমি নিজের সাফাই গেয়ে কিছু বলতে চাই না। আমি শুধু আমার জীবনের সেইটুকুই বলতে চাই যা ভবিষ্যতে বেলা আর বুতুলের জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে।

আপনারা কয়েকবার বোম্বাই এসেছেন। জিন্নাহ সাহেব বোম্বাই বহুবার দেখেছেন। কিন্তু আপনারা আমাদের বাজার কেন দেখবেন? যে বাজারে আমি থাকি তার নাম ফারস রোড। গ্রান্ট রোড আর মদনপুরার ঠিক মাঝখানে ফারস রোড। গ্রান্ট রোডের অন্যদিকে লেমিংটন রোড, অপেরা হাউস এবং চৌপাটি; মেরিন ড্রাইভ এবং পোর্ট এলাকায় ভদ্রলোকেরা থাকেন। এই দুই অঞ্চলের মাঝখানে ফারস রোড,—এই ফারস রোডে গরীব ও বড়লোক সবাই একসঙ্গে ফায়দা উঠাতে পারে—যদিও ফারস রোড মদনপুরার খুবই কাছে, কারণ দারিদ্র আর পতিতার অবস্থানের মধ্যে ফারাক প্রায় থাকে না বললেই চলে। এই বাজার খুব সুন্দর নয়। এর মধ্যে আবার ট্রামের ঘড় ঘড় আওয়াজ দিনরাত্রি লেগে আছে। দুনিয়ার যত আওয়ারা কুত্তা, ছোকরা, রসিক নাগর, বেকার আর পুরানো দাগী এই গলির শোভা বর্ধন করে আছে। খোড়া, নুলো, তামা-শাবাজ—যাদের কোন ঠিক ঠিকানা নেই, সিফিলিস, এবং গণোরিয়ার রোগী, কানা, কোকেনওয়ালা, পকেটমার, সবাই এই বাজারে বুকটান করে চলাফেরা করে। নোংরা হোটেল, স্যাতস্তেতে ফুটপাত, আবর্জনার স্তুপের লাখ লাখ মাছির ভনভনানি, কয়লা আর জ্বালানী কাঠের বিদি-গিশ্রি গুদাম, পেশওয়ারী দালাল, শুকনো ফুলের মালা, সিনেমার অশ্লীল ছবির বই বিক্রেতা, কোকশাস্ত্র এবং ন্যাংটা ছবির দোকানদার, চীনা ও মুসলিম নাপিত, ল্যাংগোট পরা খিস্তিবাজ পালোয়ান—আমাদের সমাজের সমস্ত আবর্জনাই এই ফারস রোডে পাওয়া যাবে। সবাই জানে আপনি এখানে কেন আসবেন। কোন ভদ্রলোক এখানে ক্ষণিকের জন্যেও দাঁড়াতে পারেন না। যত ভদ্রলোক আছেন তাঁরা সব গ্রান্ট রোডের ঐ পারে থাকেন—আর যারা আরও ভদ্রলোক তাঁরা মালাবার হিলে থাকেন।

আমি একবার জিন্না সাহেবের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। এইখানে ঝুঁকে সেলাম করেছিলাম। আপনার ওপর (জিন্না সাহেব) বুতুলের যে শ্রদ্ধা আছে তা আমি যথাযথভাবে ব্যক্ত করতে পারব না। খোদা আর রাসুলের পরে যদি ও আর কাউকে চায় তবে তিনি হচ্ছেন আপনি। ও আপনার ছবি লকেটে বাঁধিয়ে নিজের বুকের ওপর ঝুলিয়ে রেখেছে।

কোন বদ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়···বুতুলের বয়স এখন মাত্র এগারো বৎসর, খুবই ছোট্ট মেয়ে, যদিও ফারস রোডের বাসিন্দারা ওর সম্পর্কে এখন থেকেই কু-ইচ্ছা পোষণ করছে। কিন্তু কি করা যাবে, অন্য কোন এক সময়ে তা আপনাকে বলব।

এই হচ্ছে ফারস রোড যেখানে আমি থাকি। ফারস রোডের পশ্চিম কোনে চীনা নাপিতের যে দোকান তাই ঠিক একপাশে এক অন্ধকার গলির মোড়ে আমার দোকান। লোকে অবশ্য একে দোকান বলে না। কিন্তু আপনি সমঝদার মানুষ। আপনার কাছে কী লুকোব। আর কী ই বা বলব, এখানেই আমার দোকান। এখানেই আমি ব্যবসা করি, বানিয়া, সবজীওয়ালা, ফলওয়ালা, আটাওয়ালা, সিনেমাওয়ালা, কাপড়ওয়ালা বা অন্যান্য দোকানদার যেমন ব্যবসা করে এবং খরিদ্দারকে খুশী করবার ও নিজের ফয়দার কথা ভাবে, আমার ব্যবসাও ঠিক সেই রকম, পার্থক্য শুধু এইটুকু যে আমি তাদের মত ব্লাকমার্কেট করি না। আমার আর অন্য ব্যবসায়ীর মধ্যে এ ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই।

দোকানদারের পক্ষে এ জায়গা ভাল নয়—রাত্রি তো দূরের কথা, দিনেও লোকে এখানে হোঁচট খায়। এই অন্ধকার গলিতে মানুষ নিজের পকেট উজার করে দিয়ে যায়। মদ খেয়ে বমি করে, দুনিয়ার যত গালি-গালাজ আছে তা বলে চলে। কথায়-কথায় এখানে চাকু চলে, আর দুতিন দিন পরে পরেই খুন হয়। আমিও তেমন কোন উচ্চ খানদান পতিতা নই যে, পওন পুলে কিম্বা ওরলিতে সমুদ্রের ধারে কোন ঘর নেই। আমি একজন সাধারণ পতিতা, যদিও সারা হিন্দুস্থান আমি দেখেছি, বিভিন্ন ঘাটের জল খেয়েছি, নানান লোকের মজলিসে বসেছি, তবুও এই বৎসর থেকে বোম্বাই শহরে—ফারস রোডের এই দোকানে আমি বসে আছি। আর এখন এই দোকানের সেলামী আমি ছ'হাজার টাকা পর্যন্ত পেতে পারি—যদিও এই জায়গা তেমন ভাল নয় বরং খারাপই। চারিদিকে পোকা গিজ গিজ করছে, আবর্জনার স্তুপ জমে আছে, ঘেয়ো কুত্তা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে খরিদ্দারকে কামড়াতে যায়—তবুও এই জন্যে আমি ছ'হাজার টাকা পর্যন্ত সেলামী পেতে পারি।

এখানেই দোতলা বাড়িতে আমার দোকান। এতো ছুটো ঘর আছে। সামনেরটা দোকানের বৈঠকখানা। এখানে আমি গান গাই, নাচি, খরিদ্দারকে খুশি করি। পেছনের ঘরে রুটি তৈরী করি, স্নান করি এবং শোয়ার কাজও সারি। এখানে একদিকে একটা পালঙ্ক আছে। এই পালঙ্কের নীচে আমার কাপড়ের সিন্দুক আছে। বাইরের ঘরে বিজলী আলো আছে, কিন্তু ভিতরের ঘরে কোন আলো নেই—একেবারে অন্ধকার। বাড়ির মালিক অনেক বছর ধরে কোন চুনকাম করেনি, করেও না। আমার মত এত অঢেল সময় আর কার আছে। আমি সারারাত ধরে নাচি, আর দিনে এখানেই পাশ বালিশে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমোই।

বেলা আর বুতুলকে পেছনের এই ঘর দিয়েছি। খরিদ্দাররা হামেশাই হাত মুখ ধোয়ার জন্য ঘরে আসে। বেলা আর বুতুল ভয় ভয় চোখে ওদের দিকে চেয়ে থাকে। ওদের চোখের সেই ভাষাই আমার এই চিঠি বলছে। ওরা যদি আমার কাছে না থাকত তবে এই পাপী পতিতা আপনার খিদমতে এই বেয়াদপি পেশ করত না। জানি ছুনিয়া আমায় থু থু দেবে, হয়তো আপনার কাছে আমার এই চিঠি পৌঁছবে না, কিন্তু তবু আমি নিরুপায়। এই চিঠি লিখেই যাব—এটাই হচ্ছে বেলা আর বুতুলের ইচ্ছা।

আপনি হয়তো ভাবছেন, বেলা আর বুতো আমার মেয়ে। না, তা ঠিক নয়। আমার কোন মেয়ে নেই। এই ছুটো মেয়েকেই আমি বাজার থেকে কিনেছি। হিন্দু মুসলমানের যখন তুমুল দাঙ্গা—গ্রাণ্ট রোড, ফারস রোড এবং মদনপুরাতে মানুষের রক্ত জলের স্রোতের সঙ্গে বয়ে চলেছিল, সেই সময় এক দালালের কাছ থেকে আমি বেলাকে তিনশ' টাকায় কিনি। এই মুসলমান দালাল বেলাকে দিল্লী থেকে এনেছিল। বেলার বাবা মা ঐখানে থাকত।

বেলার বাবা-মা রাওয়ালপিণ্ডির রাজা বাজারের পেছনে পুঞ্চ হাউসের সামনে যে গলি সেই গলিতে থাকত। মধ্যবিত্ত পরিবার ছিল। ভদ্র এবং খুব সাদাসিদে। বেলা তার বাবা-মার একমাত্র মেয়ে। রাওয়ালপিণ্ডিতে যখন মুসলমানরা তলোয়ার নিয়ে হিন্দু নিধন যজ্ঞ শুরু করল, তখন ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী।

বারোই জুলাইয়ের ঘটনা। বেলা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল। তাদের এবং অন্যান্য হিন্দু বাড়ির সামনে অনেক লোকের জটলা দেখল। তারা অস্ত্রে সস্ত্রে সজ্জিত ছিল এবং বাড়ির পর বাড়ি আগুন লাগাচ্ছিল। —সেই সব বাড়ির লোকদের শিশুদের মেয়েদের ঘর থেকে টেনে বের করে হত্যা করছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে নানারকম ভয়-ভীতিপূর্ণ ধ্বনি দিচ্ছিল। বেলা নিজের চোখে তার বাবাকে কাটতে দেখল—মাকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে দেখল। জানোয়াররা ওর মার স্তন কেটে ছুঁড়ে ফেলে দিল—যে স্তন দিয়ে মা, সব মা—সে হিন্দু আর মুসলমান মা, খৃষ্টান মা, ইহুদি মা—সে যাই হোক না কেন তার সন্তানকে দুধ দেয় আর মানুষের জীবনে এবং সমস্ত বিশ্বে সৃষ্টির এক নতুন পরিচ্ছদ খুলে দেয়। ঐ দুধ ভরা স্তন নির্মলভাবে কাটা হয়। কে সৃষ্টির সংগে অত্যাচার করেছে, কোন জালিম অন্ধকার এই রূপের মধ্যে কালিমা ঢেলে দিয়েছে। আমি কোরান পড়েছি, আমি জানি রাওয়ালপিণ্ডিতে বেলার বাবা মাকে যা করা হয়েছে তা ইসলাম নয়, তা শত্রুতাও নয়, তা বদলাও নয়—এ এমন এক বর্বরতা, এমন এক নিষ্ঠুরতা, এমন এক শয়তানী যা অন্ধকারের বুকেই জন্ম নেয় এবং সৌন্দর্যের শেষ রশ্মিটুকুকেও কলঙ্কময় করে তোলে।

বেলা এখন আমার কাছে আছে। আমার আগে ও এক দালালের কাছে ছিল, তার আগে ও দিল্লীর একজন মুসলমান দালালের কাছে ছিল। ও যখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী তখন ওর বয়স বারো বৎসরের বেশি ছিল না। বাড়িতে যদি থাকত তবে ও আজ পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ত। আর যখন বড় হত তখন ওর বাবা মা কোন ভদ্র ঘরের গরীব ছেলের সংগে ওর বিয়ে দিত। ও ওর ছোট্ট সংসার পাতত নিজের স্বামী, ছোট শিশু সন্তান আর ঘরোয়া জীবনের ছোট ছোট খুশী দিয়ে। কিন্তু এই কোমল কুড়ি অকালেই ঝরে পড়ল। বেলাকে এখন বারো বৎসরের মেয়ে বলে মনে হয় না। ওর বয়স একটু বেড়েছে, কিন্তু জীবন ওর খুবই বিষাদময়। ওর চোখে ভয়, মানব জীবনের যে তিক্ততা, নৈরাশ্যের যে রঙ, মৃত্যুর যে পিপাসা—কায়েদে আজম সাহেব, আপনি যদি তা দেখে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারবেন। আপনি তো ভদ্রলোক। ভদ্রঘরের

হিন্দু-মুসলমানের সকল মেয়েদের নিশ্চয়ই দেখেছেন। আপনি অবশ্যই বুঝতে পারেন সরলতার কোন ধর্ম নেই। তা সমস্ত মানুষেরই সম্পদ—সারা দুনিয়ার ঐশ্বর্য। যারা তাকে ধ্বংশ করে দুনিয়ার কোন ধর্মের খোদাই তাদের ক্ষমা করতে পারে না।

বুতুল আর বেলা দুজনে আপন বোনের মত আমার এখানে থাকে। বুতুর আর বেলা আপন বোন নয়। বুতুল মুসলমান মেয়ে, বেলা হিন্দু পরিবারের। আজ তারা দুজনে ফারস রোডে এক পতিতার বাড়িতে বসে আছে। বেলা রাওয়ালপিণ্ডি থেকে এসেছে, আর বুতুল জলন্ধরের এক গ্রাম···খেমকরণ, সেখানকার এক পাঠানের মেয়ে। বুতুলরা সাত বোন। তিনজনের বিয়ে হয়েছিল, বাকী চারজন ছিল কুমারী। বুতুলের বাবা খেমকরনের এক সাধারণ কৃষক। গরীব কিন্তু গর্বোদ্ধত পাঠান—যারা আজ থেকে বহু বহু বছর আগে খেমকরনে এসে ঘর বেধেছিল।

জাঠদের এই গ্রামে মাত্র তিন চার ঘর পাঠান ছিল। এরা যেভাবে মাথা নিচু করে থাকত, শুধু এইটুকু বললেই আপনি বুঝতে পারবেন, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও গ্রামে মসজিদ বানানোর এদের কোন অধিকার ছিল না। এরা নিজের ঘরে লুকিয়ে নামাজ পড়ত। যুগ যুগ ধরে রনজিৎ সিংহের শাসনের কাল থেকেই কোন মোমিন এই গ্রামে নামাজের আজান দেয়নি। হৃদয় এদের ধর্মের ভক্তিতে ভাস্বারিত ছিল, কিন্তু কোন কথা বলার অধিকার ছিল না।

বুতুল তার বাবার সবচেয়ে আদরের মেয়ে ছিল। সাতজনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে সুন্দর। বুতুল এত সুন্দর যেন সামান্য হাতের স্পর্শে মলিন হয়ে যাবে। পণ্ডিতজী, আপনি নিজে কাশ্মীরের মানুষ, এলাকার না হয়েও আপনি জানেন সৌন্দর্য কাকে বলে। এই সৌন্দর্যই আমার দুর্গন্ধময় জঞ্জালে এমনভাবে পড়ে আছে যে একে শরীফ আদমী পাওয়াই হচ্ছে মুশকিল। এই আবর্জনায় বদমাশ মারোয়াড়ি, ঘন মুছওয়ালা ঠিকেদার, অপবিত্র চাহনির কালোবাজারীদের দেখা যায়। বুতুল একেবারে নিরক্ষর। ও শুধু জিন্না সাহেবের নাম শুনেছে। পাকিস্তান এক আচ্ছা তামাশা মনে করে ও শ্লোগান দিয়েছিল—তিন-চার

বৎসরের শিশুরা যেমন ঘরের মধ্যে শ্লোগান দিতে থাকে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। এগারো বৎসরই তো ওর বয়স। নিরক্ষর বুতুল—মাত্র কয়েকদিন আগে ও আমার কাছে নিয়ে আসে। পাঁচশ টাকা দিয়ে আমি ওকে কিনে নিই। এই হিন্দু দালাল ওকে লুধিআনা থেকে এনেছিল—এক জাঠ দালালের কাছ থেকে। এর আগে ও কোথায় ছিল জানি না।

হ্যাঁ, এক লেডি ডাক্তার আমাকে অনেক কিছু বলেছেন। আপনি যদি তা শোনেন তবে পাগল হয়ে যাবেন। বুতুল আধা পাগল। ওর বাবাকে জাঠরা এমন নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে যে হিন্দু সভ্যতার অতীতের ছ'হাজার বৎসরের চামড়া টেনে খুলে দিয়েছে মানুষের বর্বরতা জানোয়ারের উলঙ্গ রূপ নিয়ে সবার সামনে এসেছে। প্রথমে জাঠরা তার চোখ তুলে নেয়, তারপর মুখে প্রস্রাব করে দেয় এবং পরে গলা থেকে চিরে পর্যন্ত নামিয়ে নাড়ি ভুড়ি বের করে। ওরা বিবাহিতা মেয়েদের জবরদস্তি মুখ কালি করে এখানে ওদের বাবার লাশের সামনেই। রেহানা, গুল হুরখ্‌সা, মারজানা, সোমান বেগমকে—এক এক করে জানোয়ারেরা—তাদের মন্দিরের মূর্তিকে অপবিত্র করে। যারা ওদের জীবন দান করেছে, যারা ওদের গুন গুন করে গানের কলি শুনিয়েছে, যারা ওদের সামনে লজ্জায়, ভালোবাসায়, পবিত্রতায় মাথা নীচু করেছিল—সেই সমস্ত বোনের, স্ত্রীর, মায়ের সঙ্গে অসভ্য আচারণ করেছে। হিন্দুধর্ম তার নিজের ইজ্জত খুইয়েছে, নিজের ঐতিহ্যকে ধ্বংস করেছে, নিজের সংস্কৃতিকে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। আজ ঋক্ বেদের প্রতিটি মন্ত্র স্তব্ধ, আজ গ্রন্থসাহেবের প্রতিটি দোহা লজ্জায় অবনত, আজ গীতার প্রতিটি শোলক ক্ষত-বিক্ষত। এমন কে আছে যে আমার সামনে অজন্তার চিত্রকলার নাম উচ্চারণ করতে পারে, আশোকের অভিলেখ শোনাতে পারে, এলোরার মন্দিরের গুণকীর্তন করতে পারে? দাঁতে পিষ্ট বুতুলের পাপড়ির মতো নরম ঠোঁট, বাহুতে জানোয়ারদের দাঁতের নিশানা আর ওর সরস দুই উরুর মাঝে তোমাদেরই অজন্তার মৃত্যুছায়া, তোমাদের ইলোরার জানাজা, তোমাদের সভ্যতার কাফন। এসো এসো তোমাদের সৌন্দর্য দেখাই—যে সৌন্দর্য এতদিন বুতুল ছিল, এসো, কাফনে ঢাকা লাশ দেখেই—যে

আর বুতুল। আবেগে আমি অনেক কিছু বলে ফেললাম। যা বললাম, তা আমার বলা ঠিক হয়নি। হয়তো এতে আপনাকে অসম্মান করা হবে। হয়তো এর থেকে বেশী কটু কথা আপনাকে আর কেউ বলেনি—কেউ শোনায়নি। হয়তো আপনি এসব কথা অনুভব করছেন। কিন্তু আমি যা দেখেছি আপনি তার জন্য কিছুই করতে পারবেন না। পণ্ডিতজী, জিন্না সাহেব বেশি কিছু করতে পারবেন না—সামান্য কিছুও করতে পারবেন না। তবু আমাদের দেশে—হিন্দুস্তান আর পাকিস্তানে স্বাধীনতা এসেছে। আর একজন পতিতার আপনাদের জিজ্ঞাসা করার অন্তত এই অধিকারটুকু আছে, বেলা আর বুতুলের কি হবে?

বেলা আর বুতুল দুটি মেয়ে, দুটি চাঁদ, দুটি সভ্যতা, দুটি মন্দির আর মসজিদ। বেলা আর বুতুল এখন ফারস রোডে এক পতিতার আশ্রয়ে আছে—যে পতিতা চীনা নাপিতের দোকানের পাশে নিজের ব্যবসার ধান্দা করে। বেলা আর বুতুলের এই ধান্দা পছন্দ নয়। আমি ওদের কিনেছি। আমি যদি চাই ওদের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে পারি। না, আমি সে কাজ করব না—যা রাওয়ালপিণ্ডি আর জলন্ধর ওদের দূরে সরিয়ে রেখেছে কিন্তু আমার খরিদ্দাররা যখন পেছনের কামরায় গিয়ে তাদের হাত-মুখ ধুতে থাকে, তখন বেলা আর বুতুলের চোখ যে আমাকে কিছু বলতে চায়।

আমি এই চোখের ভাষা বোঝতে পারব না। আমি ঠিক মতো ওদের কথা আপনার কাছে পৌঁছে দিতেও পারব না। আপনি স্বয়ং কেন এই চোখের ভাষা পড়ছেন না? পণ্ডিতজী আমি চাই আপনি বেলাকে আপনার মেয়ে করে নিন। জিন্না সাহেব, আমি চাই বুতুলকে আপনার দুলালী করে নিন। আপনি দয়া করে একবার ফারস রোডের এই ষড়যন্ত্র থেকে ওদের উদ্ধার করে নিজের ঘরে নিয়ে যান। আর লক্ষ কণ্ঠের ঐ আওয়াজ নোয়াখালী থেকে রাওয়ালপিণ্ডি, ভরতপুর থেকে বোম্বাই পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। গভর্ণর হাউসে কি এদের এই আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না? এই আওয়াজ কি আপনি শুনতে চান?

আপনার ফারস রোডের এক পতিতা

॥ কুত্তার ফ্যামিলি প্লানিং ॥

প্রথমে ডেপুটি মিনিষ্টার ফ্যামিলি প্লানিং মিনিষ্টারকে বললেন, আপনি আজকের সংবাদপত্র দেখেছেন ?

ফ্যামিলি প্লানিং মিনিষ্টার এক দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বল্লেন, আজ কত তারিখ ?

—চব্বিশে জানুয়ারি।

গুড গড। দিন কেমন করে চলে যাচ্ছে কিছু বোঝাই যাচ্ছে না। ফ্যামিলি প্লানিং মিনিষ্টার সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে মুখে ধোঁয়া নিয়ে বল্লেন, কাল থেকেই তো নতুন বর্ষ আরম্ভ হয়েছে। উঃ কী বিরাট পার্টি'ই না হয়েছিল। আপনি নিশ্চয়ই দেখেছিলেন, মিস মনচন্দা কী সুন্দর শাড়ি পড়ে এসেছিলেন।

ডেপুটি মিনিষ্টার তাকে আবার মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য বল্লেন, আজকে 'টাইমস'-এর সাত পৃষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রকাশিত হয়েছে।

— আমি শুধু ঐ সংবাদপত্র পড়ি, যাতে আমার ভাষণ ছাপা হয়। আজ দুদিন থেকে আমি কোন ভাষণ দিইনি। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ খবর আর কী হতে পারে ? মিনিষ্টার সিগারেটে এক লম্বা টান দিয়ে বললেন।

ডেপুটি মিনিষ্টার খবর পড়ে শোনালেন, জামনগর থেকে তিন মাইল দূরবর্তী অনিয়াবাদে এমন এক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে যা দিয়ে কুত্তাদের ফ্যামিলি প্লানিং করা যেতে পারে। এই প্রোজেক্ট যারা আরম্ভ করেছে তাঁরা কুত্তাদের বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যাকে রুখতে চান। কারণ ঐ প্রদেশের মানুষরা কুকুরদের জানে মারতে রাজী নয়। স্বাস্থ্য রক্ষা বিভাগ ভেটারনারী ডিপার্টমেন্টের সহায়তায় এই প্রোজেক্ট আরম্ভ করবে।—এই প্রোজেক্ট মারফত সীমিত ক্ষেত্রে কুত্তাদের অপারেশন করে নপুংষক করা সম্ভব হবে।

ফ্যামিলি প্লানিং মিনিষ্টার খবর শুনে বল্লেন, মুর্খ কোথাকার। মানুষের ফ্যামিলি প্লানিং ঠিকমতো হচ্ছে না, কুত্তাদের ফ্যামিলি প্লানিং করে কি হবে ? অযথা পাবলিকের টাকা নষ্ট হবে।

ডেপুটি মিনিষ্টার তাঁর কণ্ঠে মিলিয়ে বললেন, বিলকুল ঠিক। আমিও তাই ভাবছিলাম! আমার মাথায় এই চিন্তা এ জন্যে এসেছিল যে আমাদের

এখানেও তো ফ্যামিলি প্লানিং সফল হয়নি, কিন্তু নতুন বাজেট পাশ হওয়ার পর আমাদেরও নতুনভাবে কাজকর্ম দেখানোর প্রয়োজন আছে। সে জন্যেই এই খবরকে আমি এতোখানি গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছিলাম—ডেপুটি মিনিষ্টার আর কিছু না বলে চুপ করে গেলেন।

'হুঁ'—ফ্যামিলি প্লানিং মিনিষ্টার এক গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ কিছু চিন্তা করে উনি বললেন—পরিকল্পনাটাও নেহাত খারাপ নয়। আমাদের এই প্রদেশেও তো কুত্তা আছে।

অবশ্যই আছে। ডেপুটি মিনিষ্টার বললেন, আমি কোন কুত্তার ইন্টারভিউ নিইনি।…মানুষের ইন্টারভিউ নিয়েই ফুরসুৎ পাই না, তবে কি পরিকল্পনা নিয়ে চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করব?

ফ্যামিলি প্লানিং মিনিষ্টার চীফ সেক্রেটারিকে ফোন করে তাঁর ঘরে ডেকে আনলেন। চীফ সেক্রেটারি খবর পড়ে এবং পরিকল্পনা শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। কোন সমস্যার ওপর রায় দেওয়ার আগে উনি চুপ করে থাকা পছন্দ করেন। তা মন্ত্রীদের বুদ্ধিই হোক আর কুত্তাদের উদ্ধারই হোক।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর উনি বল্লেন, কুত্তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব বেশি নেই, কারণ ছোটবেলা থেকে টিয়া পোষার আমার সখ ছিল। আমার মনে হয় ঐ ব্যাপারে জয়েন্ট সেক্রেটারির সঙ্গে একটু পরামর্শ করলে ভালো হয়। ওনার বাড়িতে পাঁচ—পাঁচটা কুত্তা আছে।

জয়েন্ট সেক্রেটারির কাছে যখন এই প্রস্তাব রাখা হল, তখন তিনি সচকিত হয়ে বল্লেন, স্যার, যে কুত্তাদের সম্পর্কে আমি জানি সেগুলো খুব সংযমী এবং উচ্চ খানদানের। তাদের দেখাশুনার জন্যে আমি একজন কর্মচারী রেখেছি। আমার কুত্তা সময় মতো খায়, সময় মতো ঘুমায়, সময় মতো জাগে, সময় মতো স্নান করে, সময় মতো বেড়াতে যায়—ওদের হাবভাব একেবারে মানুষের মতো। এ রকম উচ্চ খানদানী কুত্তাদের জন্যে ফ্যামিলি প্লানিং-এর অনেক ব্যয় হবে। ডেপুটি মিনিষ্টার বললেন, আরে ভাই, বাড়ির পোষা কুত্তাদের কথা বলছি না। ওদের ফ্যামিলি প্লানিং-এর কোন দরকার নেই। তা মানুষই হোক আর কুত্তাই হোক। ওরা যদি

কোন বাড়িতে বা বাংলাতে থাকে তবে ওরা ফ্যামিলি প্লানিং-এর আওতায় পড়বে না। বাজারী কুত্তার কথা বলা হচ্ছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে সমস্ত সাধারণ কুত্তাদের সম্পর্কে।

জয়েন্ট সেক্রেটারি বললেন, আমার মনে হয় আণ্ডার সেক্রেটারিকে ডাকলে ভালো হয়। আমি তো সিভিল লাইন্স-এ থাকি। উনি শহরে থাকেন। বাজারী কুত্তা সম্পর্কে ওনার ভালো জ্ঞান আছে।

আণ্ডার সেক্রেটারি করফারেন্সে উপস্থিত হয়ে যখন পরিল্পনা শুনলেন তখন তিনি লাফিয়ে উঠলেন। কারণ জীবনে তিনি কয়েক বার কুত্তাদের বেদম পিটিয়েছেন, আর একবার শুধু এক হালুইকারের কুত্তা ওনার হাঁটুতে এমন জোড়ে কামড়িয়ে দিয়েছিল যে, এখনও কাছ থেকে দেখলে সেই ঘায়ের দাগ চোখে পড়ে।

আমার মনে হয় শুধু এই শহরেই দু-লাখ কুত্তা এবং দু-লাখ কুত্তি আছে। যদি প্রতিটি কুত্তি বছরে পাঁছটি করেও বাচ্চা দেয় আর তার তিনটি করে বাচ্চাও যদি বেঁচে থাকে তবে কুত্তার সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। স্যার, আমার বিশ্বাস, যদি ঐ হারে কুত্তার সংঘ্যা বেড়ে চলে তবে দশ বছরের মধ্যে এই শহরে কুত্তার সংখ্যা মানুষের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে। যে জন্যে আমাদের এখনই জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। একবার ভেবে দেখুন এই লক্ষ লক্ষ কুত্তার জন্যে কত খাদ্য নষ্ট হচ্ছে। কত রকম অসুখ-বিসুখ ছড়িয়ে পড়ছে। কত রাস্তা ঘাট নোংরা হচ্ছে। কত মানুষ হাইড্রোক্লোবিয়াতে মারা যাচ্ছে। স্যার, কুত্তা মানুষের সবচাইতে বড় শত্রু। আমার ধারণা, যদি কুত্তাদের ফ্যামিলি প্লানিং করা যায় তবে মানুষের আর ফ্যামিলি প্লানিং-এর কোন প্রয়োজন নেই।

মন্ত্রী মহোদয় তালি বাজিয়ে বললেন, হেয়ার আমিও তাই ভাবছিলাম। এই ভাবনাকে সফল করার জন্যে আমাদের কনফারেন্স ডেকেছি। আমার মনে হয় ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়েছে—আপনাদের এখন যত শিগ্রী সম্ভব কুত্তাদের ফ্যামিলি প্লানিং শুরু করে দিতে হবে। আর এইমাত্র আমি যা বল্লাম, অর্থাৎ যদি কুত্তাদের ফ্যামিলি প্লানিং সফল করতে যান তবে মানুষের আর ফ্যামিলি প্লানিং-এর কোন প্রয়োজনই

থাকবে না। এই চিন্তা ভাবনার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আপনারা পরিকল্পনাকে কার্যকরী করুন। আর এই কাজ আরম্ভ করার আগে একটা লিফলেট প্রকাশ করুন। লিফলেটের টাইটেল পেজের ওপর আমার একটি ছবি দিয়ে দিন।

ডেপুটি মিনিষ্টার প্রস্তাব দিলেন, আর অন্য দিকে কুত্তার ছবি।

মিনিস্টার ডেপুটি মিনিস্টারের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বল্লেন, আ-হা···এর কোন প্রয়োজন নেই। শুধু আমার ছবিই যথেষ্ট।

মিনিষ্টার চিন্তা করতে করতে বল্লেন, শুধু লিফলেট প্রকাশ করলেই কোন কাজ হবে না, এর জন্যে আমাদের নতুন বাজেট তৈরি করতে হবে, নতুন স্টাফ রাখতে হবে। মানুষের ফ্যামিলি প্লানিং-এ যারা কাজ করছে, তারা কুত্তার ফ্যামিলি প্লানিং-এ কাজ করতে পারবে না। কারণ মানুষ আর কুত্তার চাল চলনে অনেক পার্থক্য আছে।

ডেপুটি মিনিষ্টার বল্লেন, এখনও অবশ্য এ পার্থক্যও নেই। দু-জনেই তার থেকে দুর্বলকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে নিজের থেকে তাগড়া দেখলে লেজ গুটিয়ে নেয়।

ডেপুটি মিনিষ্টার অন্যকে থামিয়ে দিয়ে আবার বলতে লাগলেন, না···না এর জন্যে আমাদের বাজেট তৈরি করতে হবে এবং নতুন ষ্টাফও রাখতে হবে। আর সবচেয়ে জরুরী, এমন একজন লোককে এই পরিকল্পনার ইনচার্জ করতে হবে—যে কুত্তা সম্পর্কে বিশেষ খবরা-খবর রাখে।

আণ্ডার সেক্রেটারি বললেন, আমার এক ভাইপো আছে।

জয়েন্ট সেক্রেটারি বললেন, আমার এক ভাগ্নে আছে।

চীফ সেক্রেটারি বললেন, আর এক নাতি আছে।

মন্ত্রী বললেন, আমার এক জামাই আছে।

আর কেউ কিছু বললেন না। মন্ত্রী সর্বশেষ সত্য বলে দিয়েছেন আর এই সত্যিই সর্বদা জয়ী হয়। তাই পরের দিন থেকে জামাইকে চাকরীতে বহাল করা হল।

ছ'জন বাজে কথা রটিয়ে বেড়ায়, মন্ত্রীর জামাই বলে আমার এই চাকরী হয়েছে। কিন্তু আসলে এই কাজের জন্যে আমি ছিলাম উপযুক্ত মানুষ। প্রথমতঃ আমি জানোয়ারের ডাক্তার। জানোয়ারদের মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে আমার যত জ্ঞান আছে অন্য কারো তা নেই। তা ছাড়া জানোয়ারদের ভাষাও আমি জানি। কুত্তা আর বানর থেকে আরম্ভ করে মশা এবং মাছিদের বুলি আমি বুঝি—আর এ যুগে যখন ছেলে বাপের কথা বুঝতে পারেন না- আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমার কাজ কত কঠিন।

ছ'জন আর্দালি, ছ'জন কম্পাউণ্ডার এবং একটি ভ্রাম্যমাণ অপারেশন গাড়ি নিয়ে আমি এক কুত্তাকে গলির মুখে ঘিরে ফেললাম। কুত্তাটা তখন এক কুত্তির পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছিল।

কুত্তাও আমাদের খুব গভীরভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। অবশেষে ও বুঝতে পারল এই লোকগুলির মধ্যে একমাত্র আমিই ওর কথা বুঝতে পারি। ও আমাকে বলল, তুমি কি চাও?

আমি ওকে বললাম, তোমাকে অপারেশন করতে চাই।

—কেন?

—যাতে তুমি বাচ্চা পয়দা করতে না পার।

কুত্তা আমাকে বলল, আমার বাচ্চাতে তোমার কি?

আমি বললাম ওদের জন্য আমরা খাবার কোথা থেকে পাব? দেখ এই শহরে ছ'লাখ কুত্তা আছে। আগামী পাঁচ বছরে এই ছ'লাখ দশ লাখ হয়ে যাবে। বল, এই দশ লাখ কুত্তার খাবার যোগাড় আমরা কোথা থেকে করব? নিজের ছেলে মেয়েদের পেটই আমরা ভরাতে পারছি না। তাই তোমার অপারেশন খুবই প্রয়োজন।

কুত্তা বলল, তবে কর। আমি তোমাকে কোথায় নিষেধ করেছি? যদি আমাদের বংশ ধ্বংস করে মানুষের বংশ সুরক্ষিত হয় তবে কুত্তারা মানুষের জন্যে নিজেদের কোরবানী দেবে। তুমি কিন্তু অযথা এই ঝামেলা পোহাচ্ছ, কুত্তাদের খতম করে দিয়ে তোমাদের কোনই ভালো হবে না।

—কেন?

—কুত্তাদের খতম করে দিলে বেড়ালের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তুমি নিশ্চয়ই জানো, বেড়াল কত তাড়াতাড়ি বাচ্চা দেয়। আর আমরা তো নিছক কুত্তা। তোমাদের এঁটো খেয়ে দিন গুজরাই। বেড়াল তো সোজা তোমাদের কিচেনে ঢুকে দুধ খেয়ে পালায়। এসব জানো?

কুত্তা খুব যুক্তিসঙ্গত কথাই বলেছিল। আমি যখন অফিসারদের কুত্তার কথাগুলো বললাম, তখন তাঁরা পরামর্শ করে রায় দিলেন, কুত্তা সঠিক কথা বলেছে। সুতরাং কুত্তার ফ্যামিলি প্লানিং বন্ধ রেখে বেড়ালের ওপর হামলা করতে হবে। আমাকে নতুন আদেশ এবং নতুন ষ্টাফ দেয়া হল। নতুন বাজেট তৈরি হল এবং প্যামপ্লেট বিলি করা হল। এর নাম ছিল—'বেড়ালের পরিবার পরিকল্পনা।'

আট দশ দিন চেষ্টা-চরিত্র করার পর একটি নাদুস নুদুস বেড়ালকে ধরতে পারলাম। আমাকে দেখে বেড়ালটা অনেকক্ষণ ধরে গরগর করল, তারপর থাবা বের করে ঘুরতে লাগল। আমার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ও বলল, কি মশায়, আমাকে চেন না নাকি। মন্ত্রীর পোষা বেড়াল আমার বেগম। চাকরী যদি খোয়াতে না চাও তবে আমাকে এখুনি ছেড়ে দাও। না হলে নালিস করে দেব।

আমার খুব রাগ হল। বললাম, বেড়াল মশাই, তুমি কি ভেবেছ, তোমার বৌ যদি কোন এক মন্ত্রীর বিড়াল হয়, আমিও এক মন্ত্রীর জামাই। আমি তোমার মন্ত্রীর চেয়ে কমজোরী নই যে তোমাকে ভয় পাব।

আমার জবাব শুনে হাড় বজ্জাত বেড়ালটা দমে গেল। আমাকে ও বলল, তবে বল, তুমি কি চাও?

আমি ওকে আমার স্কিম বোঝালাম। স্কিম শুনে ও বলল: ও, তোমরা তবে মানুষের ফ্যামিলি প্লানিং, কুত্তার ফ্যামিলি প্লানিং-এ বদলে দিয়েছ। আর এখন কুত্তার ফ্যামিলি প্লানিং, বেড়ালের ফ্যামিলি প্লানিং এ বদলাচ্ছে, যাতে আমাদের বাচ্চারা তোমাদের খাবার না খেয়ে ফেলে।

—হ্যাঁ ঠিক বলেছ। আমি তাই বলতে চাচ্ছি।

আমি বজ্জাত বেড়ালটাকে খুব মোলায়েম কণ্ঠে বোঝাতে লাগলাম, আমরা তোমার জান চাচ্ছি না শুধু অপারেশন করতে চাই। আমরা অহিংসবাদী। অপারেশনে তোমার মাত্র দু'মিনিট কষ্ট হবে। এর পরে

আট দিন ধরে তোমাকে প্রতিদিন বাসি-মুখে নাস্তার আগে একটি করে ট্যাবলেট খেতে হবে।

বেড়াল বলল, খুব ভালো কথা। মানুষের জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য আমরা আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যত খতম করতে প্রস্তুত। কিন্তু মনে রেখ, তোমরা যদি আমাদের খতম কর, তবে আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যতও আগের চেয়ে অনেক দুর্ভোগের মধ্যে পড়বে।

আমি ঘাবড়িয়ে বেড়ালকে জিজ্ঞেস করলাম, তা-তা, কেমন করে?

ও বলল, আরে মুর্খ, ভাবছ না কেন, এ দুনিয়াতে বেড়াল যদি না থাকে তবে ইঁদুরের কী হবে। আজও মানুষের খাদ্য চারভাগের একভাগ ইঁদুর খেয়ে ফেলে। আর এর পরিবর্তে তারা কি দেয়? প্লেগ আর দশ রকম অসুখ। একবার এদিকটা ভাবো। যদি এই শহরে বেড়াল না থাকে তবে এক বৎসরেই এক কোটি ইঁদুর বেড়ে যাবে।

আমি ওর কথা স্বীকার করে নিয়ে বললাম, তুমি ঠিকই বলেছ।

—'যদি তোমরা জানোয়ারদের ফ্যামিলি প্লানিং চালু করতে চাও তবে প্রথমে ইঁদুর দিয়েই শুরু কর।' বেড়াল আমাকে বলল।

আমি এই বুদ্ধিমান বেড়ালের কথা মন্ত্রীকে বুঝিয়ে বললাম। শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেয়ার ছেড়ে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বললেন, খুব সত্যি, খুব সত্যি, আমি নিজেই তা ভাবছিলাম।

সুতরাং আমরা আবার স্কিম পাল্টালাম। আবার নতুন ষ্টাফ রাখা হল, নতুন বাজেট পাশ হল এবং নতুন পেমপ্লেট ছাপা হল। আমাদের প্রচণ্ড বিশ্বাস হল এবার আমরা সম্পূর্ণ সঠিক রাস্তায় যাচ্ছি। এখন সমস্ত কাজ পরিকল্পনানুযায়ী হবে এবং তাড়াতাড়ি শেষ হবে।

কিন্তু খুব শীঘ্রই বুঝতে পারলাম, এ কাজ খুব সহজ নয়। প্রথমে তো কর্পোরেশনের সঙ্গে আমাদের গণ্ডগোল হল। যখন আমাদের ষ্টাফ অপারেশন করার জন্যে ইঁদুর ধরতে গেল তখন আমরা বুঝতে পারলাম, শহরের তামাম ইঁদুর কর্পোরেশনের হাতের মুঠোর মধ্যে। আমাদের এর ওপর কোন দাবী নেই। কর্পোরেশন যতক্ষণ হুকুম না দিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আইন অনুযায়ী আমরা একটি ইঁদুরকেও অপারেশন করতে পারব না। আমরা খুব ক্রুদ্ধ হলাম, আমাদের দপ্তরের মন্ত্রী কর্পোরেশনের মেয়রের কাছে একটি

চিঠি লিখলেন। এই ভাবে কয়েক মাস কেটে গেল। কর্পোরেশনের লোকেরা শহরের ইঁদুর আমাদের জিম্মায় দিতে রাজী নয়, ওরা ইঁদুরগুলোকে একেবারে মেরে ফেলতে চাইছিল—অর্থাৎ এতোদিন ধরে যা হয়ে আসছিল। আর আমরা—পরিবার পরিকল্পনার লোকেরা, জানে না মেরে অপারেশন করতে চাইছিলাম–যাতে আর ইঁদুর পয়দা না হয় এবং আমাদের পরিকল্পনাও সফল হয়।

দেড় বৎসর ধরে এই ঝগড়া-ঝাটি চলল। অবশেষে ওপর থেকে নির্দেশ এল, প্রথমে কর্পোরেশন ইঁদুরগুলোকে মেরে- ফেলবে; তারপর আমাদের হাতে তুলে দেবে—যাতে আমরা তাদের অপারেশন করতে পারি। উপরওয়ালা দু'পক্ষেরই কথা রেখেছে। কিন্তু মরা ইঁদুরের অপারেশন করা বৃথা আর আমাদের পরিকল্পনাও খুব অসুবিধার মধ্যে পড়ত। তাই আমাদের মন্ত্রী আমাকে ডেকে বললেন বাবাজী, ঝগড়া-ঝাটি করে কি লাভ? শহরের মেয়র নিজেদের লোক। এটা ওনার প্রেষ্টিজের ব্যাপার। শহরের ইঁদুর যদি ওনি নিজের কাছে রাখতে চান, তবে রেখে দিন। তুমি গ্রামে যাও। শুনেছি গ্রামেও ইঁদুর আছে।

আমি বললাম, থাকা ত উচিত। কিন্তু তা শহরের ইঁদুর থেকে ডবল বড় সড় এবং লড়াকু। এর জন্যে আমার আরও স্টাফ চাই।

—আরও স্টাফ নিয়ে নাও।

গ্রামে যাওয়ার জন্য দুটো জীপ চাই।

—দুটো জীপ নিয়ে নাও। কিন্তু এখন শহরের ইঁদুরের কথা ছেড়ে দাও। গ্রামের ইঁদুরের দিকে দৃষ্টি দাও।

আমি বললাম, শহরের ইঁদুরেরা খুব ভদ্র। ফ্যামিলি প্লানিং-এর কথা ওরা খুব সহজেই বুঝতে পারে। কিন্তু এই গোঁয়ার, গোয়া ইঁদুরদের বোঝানোর জন্যে আমাদের অনেক বেশি প্রপাগাণ্ডা করতে হবে।

মন্ত্রী খুব স্নেহের সঙ্গে বললেন, নতুন আর একটা প্যামপ্লেট তুমি ছাপিয়ে নাও। এখন আমার একটা নতুন ছবি এসেছে।

একদিন যখন সবকিছু যোগাড় যন্ত্র হয়ে গেল, তখন আমরা পেরেক আর কাটা দিয়ে ইঁদুরের পরিবার পরিকল্পনা আরম্ভ করার জন্যে গ্রামে

গেলাম। কিন্তু গ্রামের লোক আমাদেরকে গেটের কাছে ঘেঁষতে দিল না। রাস্তার মাঝখানে লাঠি সোটা নিয়ে আমাদের ঘিরে ফেলল।

ওদের সর্দার বলল: ইঁদুরের ফ্যামিলি পরিকল্পনা! কী বেকুব! জানো না, ইঁদুর যদি আমাদের খেতে না থাকত তবে ক্ষেতের অর্ধেক শস্য পোকামাকরে খেয়ে ফেলত? ইঁদুরই তো আমাদের খেতে গর্ত খুঁড়ে পোকামাকড় খেয়ে ফেলে—আর আমাদের ফসল রক্ষা করে। আমরা ওদের পরিবার পরিকল্পনা হতে দেব না। কোন মতেই হতে দেব না। এখান থেকে চলে যাও।

আমি নিজের মনে মনে বললাম, কী অদ্ভুত সমস্যা! আমরা যদি কুত্তার প্লানিং করি তবে ইঁদুর বেড়ে যায়। আর ইঁদুর খতম করলে পোকামাকড় বেড়ে যায়। কী, কী করা যায়?

আমরা গ্রাম থেকে পালিয়ে এলাম। কিন্তু কারো ধমক বা ভয়ে কী আমাদের পরিকল্পনা বন্ধ থাকতে পারে? এ তো সরকারী কাজ, হামেশাই চলতে থাকে।—এক পরিকল্পনা সফল না হলে তার জায়গায় আর এক পরিকল্পনা হবে।

শুনেছি আমাদের দপ্তর খুব শীঘ্রই পোকা-মাকড়ের ফ্যামিলি প্লানিং-এর কাজ শুরু করবে। এই পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হচ্ছে আমাদের বিরোধীরা। তারা আমাদের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমেছে। কৃষি বিভাগ এক জোড়ালো প্রোটেষ্ট নোটে লিখেছে, এদেশের রেশম পোকার পরিবার পরিকল্পনা তারা কখনই হতে দেবে না। বহু সরকারী অফিসার এই প্রোটেষ্ট নোটকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বোধ হয় এই ভেবেই অভিনন্দন জানিয়েছেন যে সরকারী অফিসাররা এক ধরনের রেশম পোকা।

কিন্তু কারো ভয়ে বা হুমকিতে কী আমাদের ফ্যামিলি প্লানিং-এর কাজ বন্ধ থাকতে পারে? নতুন প্যামপ্লেট ছাপা হচ্ছে নতুন বাজেট পাশ হয়েছে, নতুন ষ্টাফ রাখা হয়েছে। আর আমি এ বৎসরে নিজের মাইনে বেশ বাড়িয়ে নিয়েছি,—কারণ আমার ঘরে খুশির দিন আসছে।

।। পাপ ।।

শঙ্করের যখন ঘুম ভাঙল তখন ভোরের আলো ঝুঁকে পড়া আমের মঞ্জরীর মধ্যে দিয়ে ঘরে এসে পড়েছিল। দরজা খুলে শঙ্কর প্রায় লাফিয়ে বারান্দায় গেল। হকার বারান্দায় খবরের কাগজ ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। ঝুঁকে পড়ে শঙ্কর কাগজটা তুলে নিল। কাগজ খুলতেই মোটা হরফের হেড লাইনের ওপর ওর চোখ পড়ল। চোখ পড়তেই ওর বুকটা ধক্ করে উঠল। তীরের গতিতে ওর চোখ জলে ভরে গেল। টলমল অশ্রু নিয়েই ও লাইনের ওপর চোখ বুলাতে লাগল এবং তা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করলো। কিন্তু ও কিছুই পড়তে পারল না। বারান্দায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

ঠিক এই সময় ওর স্ত্রী বালা চায়ের কাপ নিয়ে এল।

বালা বেশ রুষ্টভাবে ওকে বলল, এত রাত্রি পর্যন্ত লেকচার তৈরি করলে, তবুও তোমার চিন্তা শেষ হল না?

'হুঁ' না—কিন্তু—শঙ্কর অন্যমনস্কভাবে বিড়বিড় করে বলল।

বালা শঙ্করের হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, 'কিন্তু' কি? এত দেরিতে তো ঘুম থেকে উঠেছ, এখনও যদি চিন্তাই কর তবে তৈরি হয়ে আমাদের কখন বেড়াতে নিয়ে যাবে? মনে আছে তুমি কি বলেছিলে? আজ আমার কলেজ বন্ধ।

'কিন্তু।'

"আমি কোন কিন্তু টিন্তু শুনব না। তিন মাস হতে চলল তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে যাওনি। আজ তুমি কথা দিয়েছিলে, তোমাকে কিছুতেই ছাড়ছি না। বাচ্চারা সকাল থেকে সেজেগুজে বসে আছে। রঞ্জন, দেবী, কান্তা, তিনজনই তৈরি। তুমিও তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। দেখ, আজকের দিনটা কেমন সুন্দর, বলতে বলতে বালা শঙ্করের কাছে এসে দাঁড়াল।

শঙ্কর মাথা তুলে বাইরের দিকে তাকাল।

আজকের দিনটি অন্য দিনের মতোই নির্মল, স্বচ্ছ, কোমল এবং উত্তপ্ত, সুন্দর এবং উজ্জ্বল। আকাশে সূর্য ঝলমল করছিল। এখানে

ওখানে সাদা সাদা মেঘের ফালি পাখনা মেলে রাজহাঁসের মত মন্থর গতিতে সাঁতার কেটে চলেছিল।

কিছুক্ষন পরে শঙ্কর বাড়ির সবাইকে নিয়ে বাসে করে চৌপাটির দিকে যাচ্ছিল। ওরা সবাই শঙ্কর, তার স্ত্রী বালা, ছেলে রঞ্জন, বড় মেয়ে দেবী এবং ছোট মেয়ে কান্তা বাসের দোতালায় বসেছিল।

ছায়াবৃতা রাস্তার ওপর ঝুকে পড়া গাছের শাখা-প্রশাখাগুলো কখনও কখনও বাসের জানালার পাশ দিয়ে সর সর করে চলে যাচ্ছিল। রঞ্জন হঠাৎ জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা গাছ থেকে শুকনো আমের পাতা ছিঁড়ে নিল। আনন্দে চিৎকার করে ও ওর বাবাকে আমের পাতাটা দেখিয়ে বলল বাবা দেখ, সোনার পাতা।

শঙ্কর বলল, সোনার পাতা নয়, আমের পাতা।

কিন্তু এর রঙ তো সোনার মত। দেখ, রোদে কেমন ঝকমক করছে। বলতে বলতে রঞ্জন দু'আঙ্গুল দিয়ে পাতাটাকে ধরে জানালা দিয়ে আসা রোদে রেখে দিল। তারপর হাসতে হাসতে ও পাতাটাকে হাওয়ায় আলতোভাবে ছেড়ে দিল। হাওয়া পাতাটাকে নিজের কাঁধে নিয়ে নিল। আর পাতাটা নাচতে নাচতে বহু দূর চলে গেল। বাসও সামনের দিকে ছুটে চলল।

শঙ্কর কি যেন চিন্তা করছিল।

রঞ্জনের সামনের সিটে তার দু'বোন কান্তা আর দেবী বসেছিল। ও তাদের বলল, আমরা প্রথমে রাণীবাগ যাব।

কান্তা তার ছোট ভাই রঞ্জনকে বলল : না, আমার প্রথমে চৌপাটিতে যাব। বাবা চৌপাটির টিকিট নিয়ে নিয়েছেন।

রঞ্জনের কালো আর খাড়া খাড়া চুল অনেক কষ্টে আঁচড়ানো হয়েছিল, কিন্তু এখন আলুথালু হয়ে গিয়েছে। ওর চোখের কাজল লেপটে গিয়েছিল। ও শঙ্করের হাতের ওপর তার ছোট হাতটি রেখে জিজ্ঞেস করল, বাবা প্রথমে রাণীবাগ যাব না?

—'না প্রথমে চৌপাটি।' দেবী বেশ ক্রুদ্ধভাবে বলল। দেবী একটু কড়া মেজাজের মেয়ে।

রঞ্জন তার বড় বোনকে ধমকে বলল : 'না' প্রথমে রাণীবাগ। রঞ্জনের মেজাজ দেবীর চেয়েও গরম।

বালা ওদের বলল : 'তোমরা দু'জনে চুপ কর।' বালা শঙ্করের বাচ্চাদের মা। ওর মেজাজ সব থেকে উগ্র। ও যখন জোরে চেঁচিয়ে উঠল তখন সমস্ত বাসের লোক ওকে দেখতে লাগল। কণ্ডাক্টর মিট মিট করে হাসছিল।

এখন পর্যন্ত কান্তা একটি কথাও বলেনি, এবার ওর বলার পালা। কান্তার সহজে রাগ হয়না। সব সময়েই ওর মুখে একটা হাল্কা হাসির রেখা লেগে থাকে। আর অন্যকে রাগায়। ধীরে ধীরে অন্যকে জ্বালাতন করে। হেসে বলল, এ বাস চৌপাটিতে যাচ্ছে, যাচ্ছে।' চৌপাটির টিকিট কাটা হয়েছে, হয়েছে। রাণীবাগ যাবে না, যাবে না।

রঞ্জন রাগে এক ঘুষি মারল। কান্তাও সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জনের প্রতিউত্তর দিল। দেবী ওদের দু'জনকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ওরা দু জনেই দেবীকে মারতে লাগল। বালা তিনজনকেই চড় কষল। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল।

কণ্ডাক্টর বলল, কি, বাস থামাব?

'না ভাই, শঙ্কর খুব আস্তে বলল : এ তো রোজকার খেলাতামাশা। তুমি কতবার বাস থামাবে?

কণ্ডাক্টর বলল : আপনার বাচ্চারা খুব দুষ্টু?

—'হ্যাঁ ভাই, খুব দুষ্টু।'

বালা শঙ্করকে মুখ ঝামটিয়ে বলল, তুমি ওদের কিছু বল না। বলে এত বাড় বেড়েছে। সকাল থেকে দেখছি, এদের মাথায় চড়িয়ে রেখেছ। সব আব্দার শুনছ।

রঞ্জন আবার নেকিয়ে নেকিয়ো কঁদতে লাগল, আমি, চোপাটি যাব না। রাণীবাগ যাব। আমি চৌপাটি যাব না, রাণীবাগ যাব।

শঙ্কর বাস কণ্ডাক্টরকে বলল, বাস একটু থামাও।

রাণীবাগে আফ্রিকার নানারকম গাছ, বাঘ, জিরাফ ও উটপাখি ছিল। আর ছিল বার্মার সাপ, বাংলাদেশের চিতাবাঘ, কাশ্মীরের খয়েরী

রঙের ভাল্লুক, ঝিল এবং হ্রদের কুমীর, জলে ডুব দিয়ে পয়সা খোঁজে এমন স্তীল, রঙ-বেরঙের পায়রা, ক্লার্কদের মতো শুকনো উট, নেতাদের মত হরদম কথা-বলা তোতা, আর আমীরের মত চালচলন পোষা শুয়োর।

উত্তর প্রদেশের শ্যামবর্ণ হনুমানও এখানে ছিল। হনুমানগুলো লেজ পেচিয়ে ঝুলছিল। টাংগানিকার লেজহীন বানরও ছিল। তাদের বক্তব্য বানর আর মানুষের মধ্যে শুধু যদি লেজেরই পার্থক্য হয় তবে আমাদের আবার চিড়িয়াখানা বন্ধ করে রেখেছ কেন?

এক কোণে একটা সাদা রঙের বানর তার সোনালী চুল রোদে শুকোচ্ছিল। রঞ্জন ওর দিকে বাদাম ছুঁড়ে দিল। ও সেদিকে ফিরে তাকাল না। বানরটি নীল চোখে মিটমিট করে বেশ গর্ভ এবং উদাসীন ভাবে ডাট নিয়ে বসে রইল।

বাচ্চারা শঙ্করকে জিজ্ঞেস করল, বানররা তো বাদাম খায়, এ খাচ্ছে না কেন?

শঙ্কর বল্ল, হয়তো ওর পেটে কোন ব্যথা আছে। কিন্তু ও হয়তো কোন বিশুদ্ধ আর্য-জাতির বংশধর হবে, তাই কালো বাচ্চায় বাদাম খেতে নারাজ।

রঞ্জন ঘৃণার সংগে বলল, হু হু। তারপর সামনে এগিয়ে গেল।

খোলা-মেলা একটি জায়গায় বাশ ঝাড় লাগানো হয়েছিল। আর ছোট একটি বাগানে একটি চিতা বাঘ টান টান হয়েছিল। ওর সামনেই একটি মাদী চিতা তার বাচ্চাদের সংগে খেলা করছিল। ওর চোখে ঘুমের আমেজ ছিল। কখনও খুব আস্তে আস্তে গর-গর করে ডাকছিল আর হাত দিয়ে আলতো ভাবে ধাক্কা মেরে বাচ্চাদের নিচে নামিয়ে দিচ্ছিল। আর ওরা খেলতে খেলতে আবার ওর পিঠের ওপর উঠছিল। বাঁশ ঝাড়ের একটা কঞ্চির ওপর বসে একটা তোতা আর একটা তোতী টেঁ টেঁ করে রাণীবাগের দর্শকদের সামনে টিপপনী কেটে চলেছিল। আর ছিল খয়েরী রঙের ছোপ ছোপ চক্কর, সাত রঙের বাহারি ময়ূর, মধুর সংগীতজ্ঞ ময়না, আবাবিল, বুলবুলি আর আমাদের দেশে যার কোন নাম নেই বোর্নিওর সেই বুটিওয়ালা পাখি। দেবী, কান্তা এবং রঞ্জন রাণীবাগের

এ সব কিছুই দেখল। রঞ্জনের চোখের কাজল আরও লেপটে গিয়েছিল। দেবীর দুটো বেনীই খুলে গিয়েছিল। ও ওর গোলাপী ফিতা ওর মার হাতে দিল। শংকরের স্ত্রীর হাতে ছিল গোলাপী রেশমী ফিতা, আর শংকরের হাতে কান্তার স্যাণ্ডেল। কারণ ঘাসের ওপর কান্তার বেড়াতে ইচ্ছে করছিল। তিনটি ছেলে মেয়েই খুব খুশি ছিল। ওদের বাবা-মাকেও তাই খুশি খুশি দেখাচ্ছিল।

বালা শঙ্করের হাত ধরে আব্দারের সুরে বল্ল, বাচ্চাদের সংগে কিন্তু আজকে আমিও হাতির পিঠে চড়ব।

বালা এমন কোমল এবং আগ্রহের সংগে শঙ্করের দিকে তাকাল যেন ছোট্ট একটি মেয়ে ঘাড় উঁচিয়ে তার বাবাকে দেখছে। শঙ্করেরও তাকেঠিক এক ছোট্ট মেয়ের মতোই মনে হল। শঙ্কর হেসে বলল, মানুষে কী বলবে! তিন বাচ্‌চার মা হয়ে...।

উঁহু লোকে আবার কি বলবে? অন্য মেয়েরাও তো চড়েছে। ঐ যে হাতি যাচ্ছে। দেখ কতগুলো বাচ্চা নিয়ে ওদের মা বসে আছে। আমিও বসব। আমি কোনদিন হাতির পিঠে চড়িনি।

শঙ্কর প্রসন্নতার সংগে বল্ল, ঠিক আছে ঠিক আছে।

ওরা হাতিতে ওঠার জন্য চলে গেল। শঙ্কর পাশেই ঝিলের আসমানী জলে প্রস্ফুটিত পদ্ম দেখতে লাগল। কাছেই এক ঝোপের পেছনে বারসিংগা দাঁড়িয়ে ছিল। বেহাগ রাগের লয়ের মত সুন্দর আর নম্র কোকন অঞ্চলের একটি মারাটি মেয়ে তার বেনী চাঁপা ফুলে সাজিয়ে তার ছোট হাতে ছোলা নিয়ে বারসিংগাকে খাওয়াচ্ছিল। এক হাতে সে ছোলা খাওয়াচ্ছিল আর এক হাতে সে আলতোভাবে তার মাথার ওপর হাত বুলাচ্ছিল। বারশিংগার শিং-এ নরম লোম ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন পুরানো পুকুরের পাথরের ওপর শেওলা পড়েছে। যখন ছোলা শেষ হয়ে গেল তখন বারসিংগা তার লাল জিভ বের করে ওর হাত চাটতে লাগল। শঙ্কর কুমারী মেয়ের মমতা-ভরা চোখ দু'টির দিকে অপলক তাকিয়েছিল। হঠাৎ এক প্রচণ্ড অট্টহাসি সমস্ত পরিবেশকে ঝরাবিলের মতো খানখান করে ভেঙ্গে দিল। শঙ্কর ফিরে তাকাল। দেখল, হাতি

থেকে নেমে রঞ্জন কান্তার চাকু হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে খুব জোরে হাসতে হাসতে শঙ্করের দিকে ছুটে আসছে। কান্তাও পেছনে পেছনে ছুটে আসছে।

—আমার চাকু দিয়ে দে।

—না দেব না।

—দিয়ে দে বলছি।

—দেব না।

দিব না? কান্তা রন্‌জনকে এক চর মারল।

রঞ্জনও এক চর মেরে বলল, দেব না।

দু জনে মারামারি করতে লাগল।

কান্তার বেনী খুলে গিয়েছিল। ওর ফ্রকে ময়লা লেগেছিল। রনজনের প্যান্ট থেকে ফুল মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। সবুজ এবং টক কুল দেখে বলার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল। বালা রনজনকে কানে ধরে দুই চর মারল। রন্‌জন চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। বালা রন্‌জনকে টেনে হিচড়ে কলের কাছে নিয়ে গেল। জল দিয়ে তার চোখে লেপটানো কাজল ধুয়ে দিয়ে কুলগুলি চৌবাচ্চার মধ্যে ফেলে দিল। রন্‌জন ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাদতে লাগল এবং চৌবাচ্চায় সবুজ হীরের মতে জ্বলেজ্বলে গোল কুলগুলির দিকে লোভী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল। আর ওর মা যতক্ষণ না ওকে গ্যাসভর্তি বেলুন কিনে দিল ততক্ষন ও চৌবাচ্চার কাছ থেকে এক চুলও নড়ল না।

বেলুন নিয়ে ও টক কুলের কথা ভুলে গেল। এদিকে ওদের মা কান্তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাল—মাত্র এক দিনের জন্য ওই চাকু রন্‌জনের কাছে থাকবে। কান্তা রাজী হয়ে গেল।

রঞ্জনের হাতে লম্বা সুতো ছিল। সুতোর মাথায় বেলুন উড়ছিল। বেলুনে গ্যাস ভরা ছিল বলে উড়ছিল। চকে চার-চারটি ফোয়ারা ছিল। তার ওপর দাঁড়িয়ে দেবী, রঞ্জন এবং কান্তা ঘুড়ির মতো বেলুন উড়াচ্ছিল। ফোয়ারার অনেক উপরে বেলুন হাওয়ায় ভাসছিল। রঞ্জন নিজের বেলুনটাকে বুটকা টান দিয়ে দিয়ে মাঝের সবচেয়ে উঁচু ফোয়ারার

ওপর আনার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ ফোয়ারার ধারা লেগে বেলুন কেটে গেল।

রঞ্জন আনন্দে চীৎকার করে উঠল।

চৌপাটিতে খুব ভীড় ছিল। কান্তা তার মার হাত ধরেছিল। শঙ্কর, দেবী আর রঞ্জনকে সামলাচ্ছিল। চারদিকে অসংখ্য কাচ্চা-বাচ্চা মহিলা এবং পুরুষের ভীড়। বালির ওপর ঢাকা পলাশ পাতা বিছিয়ে মহিলার এক হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার করছিল। এক জায়গায় সাত-আটজন বাচ্চা একসংগে কাগজের বাশী বাজাচ্ছিল। কেউ বা সবুজ আর লাল রঙের চশমা কিনছিল, আবার কেউ বা কাগজের কচ্ছপ, ব্যাঙ এবং মাছ সুতোয় বেধে সমুদ্রের ধারে দৌড়াচ্ছিল। অমৃতস্বরের এক নব সম্পত্তি কুলফির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আইসক্রীম খাচ্ছিল। তারা তাদের প্লেট থেকে চামচ দিয়ে আইসক্রীম তুলে মুখে দেওয়ার সময় পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

শঙ্করের স্ত্রী প্রায় ফিসফিস করে বলল, প্রায় চার মাসের।

শঙ্কর চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি করে জানলে?

'যা, আমি বুঝি মা হইনি? বালা নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে বেশ গর্বের সংগে বলল, তারপর দেবীকে দু হাতে তুলে নিয়ে চুমু খেল।

বালা শঙ্করের হাত ধরে বলল, আজ আমি পুরি খাব।

—ডাক্তার তো তোমায় নিষেধ করছেন?

—শুধু আজকেই।

—বেশ।

—চাট...দই-বড়া আর

— আচ্ছা, আচ্ছা সিংগাড়া, বার মশলার চাট, জিরা জলের আম পাপড়াও খেও।

শঙ্করের স্ত্রী অভিভূত হয়ে শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কি ব্যাপার বলতো? আজ দেখছি আমার সমস্ত কথা শুনছ। তোমাকে আজ অন্যরকম লাগছে।

শঙ্কর শুধু হাসল। ওর চোখের সামনে সংবাদপত্রের হেড লাইন আবার ভেসে উঠল।

শঙ্করের স্ত্রী প্রসন্নতার দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল, আজকের দিনটি খু-উ-ব সুন্দর।

আজকের দিনটি সত্যিই সুন্দর ছিল। পরিস্কার উজ্জ্বল, নীল ঝকমকে সোনালী এবং আনন্দে পরিপুর্ণ। সমুদ্রের ধারে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা গাধা আর ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়াচ্ছিল। এক চীনা বাজীকর ভীড়ের মধ্যে দাড়িয়ে তার আশ্চর্য খেলা দেখাচ্ছিল। নব বিবাহিত যুবক কুলফির দোকান থেকে এখন ফলের দোকানের সামনে এসে দাড়িয়েছিল। তারা কমলা আর ডালিমের রস মিলিয়ে খাচ্ছিল। বাচ্চাদের হৈ-হট্টোগোলের মধ্যেও মাঝে মাঝে মাল্লাদের গানের সুর ভেসে আসছিল।

সুর্য যখন পশ্চিম দিগন্তে হেলতে লাগল তখন ওরা বাড়িতে পৌছল। শঙ্করের স্ত্রী টেবিলের উপর কফি রেখে বারান্দার বড় বড় জানালা দুটি খুলে দিল। নারকেল গাছের ঝিরঝির পাতার ফাক দিয়ে আসা পড়ন্ত সুর্যের কিরণে মেঘের দল নারংগী রঙের শিবির গেড়ে বসেছিল। আর পাথর ভেংগে যে মজদুর মেয়েরা ঘরে ফিরছিল তাদের গান গাওয়া নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে ছুটে চলছিল। সারা ঘর সুখ আর আনন্দে পরিপুর্ণ ছিল। শঙ্করের স্ত্রী মধুর আবেশে তার মাথা স্বামীর কোলে রেখে বলল :

আজকের দিনটি সত্যিই খুব সুন্দর। তোমাকে আজ বড় অচেনা লাগছিল। মনে হচ্ছিল প্রেমের অথৈ সাগরের সুন্দরতা, ভালোবাসায় পরিপুর্ণ। যদি আজকের মতো তুমি প্রতিদিন এমনই থাক, তবে তোমার মত স্বামী আমি সারা দুনিয়ায় খুজেও পাব না।

শঙ্কর মৃদু কণ্ঠে বলল, হ্যা, আজকে আমার ব্যবহার খুব ভালো ছিল। আজ আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিনি, বাচ্চাদের ওপরও রাগ করিনি। আজ সকাল থেকেই আমি তোমার সঙ্গে আছি। এর কারণও তুমি জানো?

বালা শঙ্করের কোল থেকে মাথা তুলে খুব আশ্চর্যের সঙ্গে বলল না তো?

শঙ্কর দুঃখের আবেগে বলল, আজ এথেল রোজেনবার্গ আর তার স্বামীকে ফাসি দেওয়া হয়েছে।

'কি।' বালা নিজেকে কোন রকমে সামলিয়ে নিয়ে উঠে বসল। রঞ্জন রেডিওগ্রামে রেকর্ড বাজাচ্ছিল। রেকর্ড হাতে করে ও শঙ্করের কাছে এগিয়ে এল। শঙ্কর বলল, আজ দু'জন নিরাপরাধ নিরীহ মানুষকে ফাসি দেওয়া হয়েছে।

কান্তা তার বাবাকে বলল, বাবা, কিন্তু ওদের কি অপরাধ ছিল?

নিউইয়র্ক শহরে মনরো ষ্ট্রিট নামে যে মহল্লা আছে সেই মহল্লায় রোজেনবার্গ নামে এক মহিলা থাকতেন। তার বয়স ছিল চৌত্রিশ বৎসর। স্বামীর নাম জুলিয়াস রোজেনবার্গ। তাদের দুটি সন্তান ছিল বড় বড় নীল গভীর চোখ যার তার নাম রোবি, আর সুন্দর রোদ্রের মতো প্রাণবন্ত হাসি -মাইকেল। এই ছোট্ট আমেরিকান পরিবারের মানুষরা নিউইয়র্ক শহরে শান্তি এবং সুখী জীবন অতিবাহিত করছিল।

জুলিয়াস রোজেনবার্গ ছিল একজন ইঞ্জিনিয়ার। তার একটা ছোট কারখানা ছিল। দিনরাত সে এই মেশিনশপে কাজ করে পরিবারের সবার ভরণ পোষন করতেন। তাঁর স্ত্রী এথেল নিজের ঘর আর শিশু সন্তানের দেখাশুনা করতেন। মাঝে মাঝেই তাঁদের বেশ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এথেলের মুখে হাসি লেগেই থাকত। কারণ তাঁর স্বামী ছিলেন পরিশ্রমী এবং তাঁকে ভালবাসতেন।

এই ছোট্ট সংসারে ডেভিড গ্রীনগ্রাম নামে একজন লোক মাঝে মধ্যেই আসত। ডেভিড ছিল এথেলের ছোট ভাই। এই লোকটি ছিল জাত ভবঘুরে। মহাযুদ্ধের সময় ডেভিড কয়েকবার সেনাবাহিনীর জিনিসপত্র চুরি করে। এই অর্ধশিক্ষিত সাধারণ মেকানিক লোকটি নিজের বদ অভ্যাসের জন্যে প্রায়ই বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে ফেসে থাকত। ও বহুবার তার বোনাই জুলিয়াসের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে। ধার নিয়ে আবার নির্লজ্জের মতো জুলিয়াসের কাছে ধার চাইতে আসত। এই ব্যাপার নিয়ে দু'জনের মধ্যে মন কষাকষি হয়। এমন কি ঝগড়াঝাটিও হয়। একবার ডেভিড জুলিয়াসের কাছে চার হাজার ডলার ধার চায়। কিন্তু জুলিয়াস তাকে ধার দিতে অস্বীকার করে। তখনও বলে, বেশ একদিন টের পাবে।

এ ঘটনা ঘটে উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের জুন মাসে। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই জুলিয়াস এবং তাঁর স্ত্রী এথেলকে গ্রেফতার করা হয়। ডেভিড আমেরিকান সরকারের কাছে জবানীতে বলে, ও স্বয়ং একজন গুপ্তচর। নিজের দেশের সেনাবহিনীর গুপ্ত দলিল দস্তাবেজ ও বিদেশে পাচার করে। জুলিয়াস রোজেনবার্গ এবং এথেল রোজেনবার্গের পরামর্শ মতো ও তার স্ত্রী রুথের সহযোগিতায় 'লস অলামাস প্রোজেক্ট' থেকে পরমাণু শক্তি সম্পর্কিত তথ্য চুরি করে এথেল রোজেনবার্গ এবং জুলিয়াস রোজেনবার্গকে দেয়। আর তাঁরা এ তথ্য সোভিয়েত রাশিয়ায় পাচার করে।

ডেভিড সরকারী সাক্ষী হয়ে যায়। তার স্ত্রী রুথকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এথেল রোজেনবার্গ এবং জুলিয়াস রোজেনবার্গকে ফাসির আদেশ দেওয়া হয়। ভাই, বোন এবং বোনাই এর প্রাণ নিয়ে নেয়।

এই খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে তুমুল আলোড়ণ সৃষ্টি হয়। অভিযোগের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত এবং সমঝদার মানুষ ভালভাবেই বুঝতে পারল এসব অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। এথেল এবং জুলিয়াসকে বলির পাঁঠা বানানো হয়েছে।

দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল করা হয়। জজ তাঁর নিজের বিচার বিবেচনায় লেখেন, যদি সরকারী সাক্ষীর ওপর বিশ্বাস না করা যায় তবে অপরাধ প্রমাণিত হয় না।

আর সরকারী সাক্ষী ডেভিড গ্রীনগ্রাম তার জবানীতে বলে, আমি উনিশ শ পয়তাল্লিশ সালে পরমাণু বোমার নক্শা এবং টেকনিক্যাল তথ্যের বারো পৃষ্ঠা জুলিয়াস রোজেনবার্গকে দিয়েছি। এই সমস্ত তথ্য আমার সাধারণ শিক্ষার সাহায্যে আমার স্মরণ শক্তির সহায়তায় তৈরি করেছিলাম।

এই বয়ান সম্পর্কে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ব্যঙ্গ করে বলেন, ডেভিডের এই বক্তব্য এত খাটি যেন তার কথা শব্দের গতির চেয়েও তীব্র গতিতে দৌড়াতে পারে।

অভিযোগের প্রারম্ভে সরকারী উকিল অপরাধকে প্রমাণিত করার জন্যে এক'শ তেরোটি সাক্ষীর নাম আদালতে পেশ করেন। সেই সাক্ষীর মধ্যে ছিল—

(১) বিশ্ববিখ্যাত পরমাণু বৈজ্ঞানিকদের নাম,

(২) এফ. ই বি. (আমেরিকান গুপ্তচর পুলিশ)-এর উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিরা,

(৩) কেস যারা পরিচালনা করছিল পুলিশের সেই উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের নাম এবং

(৪) রোজেনবার্গের সেইসব বন্ধুদের নাম যারা গুপ্তচর বৃত্তিতে রোজেনবার্গ দম্পতিকে সহযোগিতা করত।

পরে অবশ্য এই সাক্ষীদের কাউকেই আদালতে পেশ করা হয়নি। কেবল সরকারী সাক্ষী এবং তার স্ত্রীর বয়ানকেই যথেষ্ট ধরা হয়।

কিন্তু এই পরমাণু বোমা সম্পর্কিত গুপ্ত রহস্য বাস্তবে কতখানি গুপ্ত ছিল? এই সম্পর্কে আমেরিকার পরমাণু শক্তি কমিশনের রিপোর্টে যে রিপোর্ট ডিসেম্বর ১৯৪৭-এ অর্থাৎ অভিযোগ শদর্পের কয়েকমাস পূর্বে হয়েছিল বলা হয়েছিল :

পরমাণু শক্তি কমিশন যে গুপ্ত দলিলসমূহ পেশ করেছে তাতে সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৪৫ সালেই পরমাণু বোমা তৈরির গুপ্ত রহস্য জ্ঞাত হয়েছে।

উনিশ শ পঞ্চাশ সালে প্রকাশ করার অপরাধে দুজন নিরপরাধ মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

ফাঁসি কি শুধু অপরাধীদেরই দেওয়া হয়?

না, কখনও কখনও নিরীহ মানুষকেও ফাঁসির মঞ্চে তুলে দেওয়া হয়।

কিন্তু কেন?

কখনও বা কোরিয়া যুদ্ধ শুরু করে দেয়, আর লক্ষ লক্ষ আমেরিকান যুবককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। কখনও বা হিরোশিমার ওপর বোমা নিক্ষেপ করে আর সারা দুনিয়ার সামনে গলা ফাটিয়ে নিজের পরমাণু শক্তির এবং বোমার ঠিকাদারীর কথা ঘোষণা করে। কিন্তু যখন অত্যাচার প্রতিরোধ করা হয় এবং অন্য দেশের বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের নিজস্ব শক্তি এবং মেধার সাহায্যে প্রকৃতির রহস্যকে উদঘাটিত করেন তখন কারো ওপর ক্রোধ হওয়া তো স্বাভাবিক। তখন কাউকে বলির পাঁঠা বানানো

দু'জন বাজে কথা রটিয়ে বেড়ায়, মন্ত্রীর জামাই বলে আমার এই চাকরী হয়েছে। কিন্তু আসলে এই কাজের জন্যে আমি ছিলাম উপযুক্ত মানুষ। প্রথমত: আমি জানোয়ারের ডাক্তার। জানোয়ারদের মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে আমার যত জ্ঞান আছে অন্য কারো তা নেই। তা ছাড়া জানোয়ারদের ভাষাও আমি জানি। কুত্তা আর বানর থেকে আরম্ভ করে মশা এবং মাছিদের বুলি আমি বুঝি—আর এ যুগে যখন ছেলে বাপের কথা বুঝতে পারেন না- আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমার কাজ কত কঠিন।

দু'জন আর্দালি, দু'জন কম্পাউণ্ডার এবং একটি ভ্রাম্যমাণ অপারেশন গাড়ি নিয়ে আমি এক কুত্তাকে গলির মুখে ঘিরে ফেললাম। কুত্তাটা তখন এক কুত্তির পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছিল।

কুত্তাও আমাদের খুব গভীরভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। অবশেষে ও বুঝতে পারল এই লোকগুলির মধ্যে একমাত্র আমিই ওর কথা বুঝতে পারি। ও আমাকে বলল, তুমি কি চাও?

আমি ওকে বললাম, তোমাকে অপারেশন করতে চাই।

—কেন?

—যাতে তুমি বাচ্চা পয়দা করতে না পার।

কুত্তা আমাকে বলল, আমার বাচ্চাতে তোমার কি?

আমি বললাম ওদের জন্য আমরা খাবার কোথা থেকে পাব? দেখ এই শহরে দু'লাখ কুত্তা আছে। আগামী পাঁচ বছরে এই দু'লাখ দশ লাখ হয়ে যাবে। বল, এই দশ লাখ কুত্তার খাবার যোগার আমরা কোথা থেকে করব? নিজের ছেলে মেয়েদের পেটই আমরা ভরাতে পারছি না। তাই তোমার অপারেশন খুবই প্রয়োজন।

কুত্তা বলল, তবে কর। আমি তোমাকে কোথায় নিষেধ করেছি? যদি আমাদের বংশ ধ্বংস করে মানুষের বংশ সুরক্ষিত হয় তবে কুত্তারা মানুষের জন্যে নিজেদের কোরবানী দেবে। তুমি কিন্তু অযথা এই ঝামেলা পোহাচ্ছ, কুত্তাদের খতম করে দিয়ে তোমাদের কোনই ভালো হবে না।

—কেন?

—কুত্তাদের খতম করে দিলে বেড়ালের সংখ্যা বেড়ে-যাবে। তুমি নিশ্চয়ই জানো, বেড়াল কত তাড়াতাড়ি বাচ্চা দেয়। আর আমরা তো নিছক কুত্তা। তোমাদের এঁটো খেয়ে দিন গুজরাই। বেড়াল তো সোজা তোমাদের কিচেনে ঢুকে দুধ খেয়ে পালায়। এসব জানো?

কুত্তা খুব যুক্তিসঙ্গত কথাই বলেছিল। আমি যখন অফিসারদের কুত্তার কথাগুলো বললাম, তখন তাঁরা পরামর্শ করে রায় দিলেন, কুত্তা সঠিক কথা বলেছে। সুতরাং কুত্তার ফ্যামিলি প্লানিং বন্ধ রেখে বেড়ালের ওপর হামলা করতে হবে। আমাকে নতুন আদেশ এবং নতুন ষ্টাফ দেয়া হল। নতুন বাজেট তৈরি হল এবং প্যামপ্লেট বিলি করা হল। এর নাম ছিল—'বেড়ালের পরিবার পরিকল্পনা।'

আট দশ দিন চেষ্টা-চরিত্র করার পর একটা নাদুস নুদুস বেড়ালকে ধরতে পারলাম। আমাকে দেখে বেড়ালটা অনেকক্ষণ ধরে গরগর করল, তারপর থাবা বের করে ঘুরতে লাগল। আমার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ও বলল, কি মশায়, আমাকে চেন না নাকি। মন্ত্রীর পোষা বেড়াল আমার বেগম। চাকরী যদি খোয়াতে না চাও তবে আমাকে এখুনি ছেড়ে দাও। না হলে নালিস করে দেব।

আমার খুব রাগ হল। বললাম, বেড়াল মশাই, তুমি কি ভেবেছ, তোমার বৌ যদি কোন এক মন্ত্রীর বিড়াল হয়, আমিও এক মন্ত্রীর জামাই। আমি তোমার মন্ত্রীর চেয়ে কমজোরী নই যে তোমাকে ভয় পাব।

আমার জবাব শুনে হাড় বজ্জাত বেড়ালটা দমে গেল। আমাকে ও বলল, তবে বল, তুমি কি চাও?

আমি ওকে আমার স্কিম বোঝালাম। স্কিম শুনে ও বলল: ও, তোমরা তবে মানুষের ফ্যামিলি প্লানিং, কুত্তার ফ্যামিলি প্লানিং-এ বদলে দিয়েছ। আর এখন কুত্তার ফ্যামিলি প্লানিং, বেড়ালের ফ্যামিলি প্লানিং এ বদলাচ্ছে, যাতে আমাদের বাচ্চারা তোমাদের খাবার না খেয়ে ফেলে।

—হ্যাঁ ঠিক বলেছ। আমি তাই বলতে চাচ্ছি।

আমি বজ্জাত বেড়ালটাকে খুব মোলায়েম কণ্ঠে বোঝাতে লাগলাম, আমরা তোমার জান চাচ্ছি না শুধু অপারেশন করতে চাই। আমরা অহিংসবাদী। অপারেশনে তোমার মাত্র দু'মিনিট কষ্ট হবে। এর পরে

আট দিন ধরে তোমাকে প্রতিদিন বাসি-মুখে নাস্তার আগে একটি করে ট্যাবলেট খেতে হবে।

বেড়াল বলল, খুব ভালো কথা। মানুষের জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য আমরা আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যত খতম করতে প্রস্তুত। কিন্তু মনে রেখ, তোমরা যদি আমাদের খতম কর, তবে আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যতও আগের চেয়ে অনেক দুর্ভোগের মধ্যে পড়বে।

আমি ঘাবড়িয়ে বেড়ালকে জিজ্ঞেস করলাম, তা-তা, কেমন করে?

ও বলল, আরে মুর্খ, ভাবছ না কেন, এ দুনিয়াতে বেড়াল যদি না থাকে তবে ইঁদুরের কী হবে। আজও মানুষের খাদ্য চারভাগের একভাগ ইঁদুর খেয়ে ফেলে। আর এর পরিবর্তে তারা কি দেয়? প্লেগ আর দশ রকম অসুখ। একবার এদিকটা ভাবো। যদি এই শহরে বেড়াল না থাকে তবে এক বৎসরেই এক কোটি ইঁদুর বেড়ে যাবে।

আমি ওর কথা স্বীকার করে নিয়ে বললাম, তুমি ঠিকই বলেছ।

—'যদি তোমরা জানোয়ারদের ফ্যামিলি প্লানিং চালু করতে চাও তবে প্রথমে ইঁদুর দিয়েই শুরু কর।' বেড়াল আমাকে বলল।

আমি এই বুদ্ধিমান বেড়ালের কথা মন্ত্রীকে বুঝিয়ে বললাম। শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেয়ার ছেড়ে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বললেন, খুব সত্যি, খুব সত্যি, আমি নিজেই তা ভাবছিলাম।

সুতরাং আমরা আবার স্কিম পাল্টালাম। আবার নতুন ষ্টাফ রাখা হল, নতুন বাজেট পাশ হল এবং নতুন পেমপ্লেট ছাপা হল। আমাদের প্রচণ্ড বিশ্বাস হল এবার আমরা সম্পূর্ণ সঠিক রাস্তায় যাচ্ছি। এখন সমস্ত কাজ পরিকল্পনানুযায়ী হবে এবং তাড়াতাড়ি শেষ হবে।

কিন্তু খুব শীঘ্রই বুঝতে পারলাম, এ কাজ খুব সহজ নয়। প্রথমে তো কর্পোরেশনের সঙ্গে আমাদের গণ্ডগোল হল। যখন আমাদের ষ্টাফ অপারেশন করার জন্যে ইঁদুর ধরতে গেল তখন আমরা বুঝতে পারলাম, শহরের তামাম ইঁদুর কর্পোরেশনের হাতের মুঠোর মধ্যে। আমাদের এর ওপর কোন দাবী নেই। কর্পোরেশন যতক্ষণ হুকুম না দিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আইন অনুযায়ী আমরা একটি ইঁদুরকেও অপারেশন করতে পারব না। আমরা খুব ক্রুদ্ধ হলাম, আমাদের দপ্তরের মন্ত্রী কর্পোরেশনের মেয়রের কাছে একটি

চিঠি লিখলেন। এই ভাবে কয়েক মাস কেটে গেল। কর্পোরেশনের লোকেরা শহরের ইঁদুর আমাদের জিম্মায় দিতে রাজী নয়, ওরা ইঁদুরগুলোকে একেবারে মেরে ফেলতে চাইছিল—অর্থাৎ এতোদিন ধরে যা হয়ে আসছিল। আর আমরা—পরিবার পরিকল্পনার লোকেরা, জানে না মেরে অপারেশন করতে চাইছিলাম যাতে আর ইঁদুর পয়দা না হয় এবং আমাদের পরিকল্পনাও সফল হয়।

দেড় বৎসর ধরে এই ঝগড়া-ঝাটি চলল। অবশেষে ওপর থেকে নির্দেশ এল, প্রথমে কর্পোরেশন ইঁদুরগুলোকে মেরে ফেলবে; তারপর আমাদের হাতে তুলে দেবে—যাতে আমরা তাদের অপারেশন করতে পারি। উপরওয়ালা দু'পক্ষেরই কথা রেখেছে। কিন্তু মরা ইঁদুরের অপারেশন করা বৃথা আর আমাদের পরিকল্পনাও খুব অসুবিধার মধ্যে পড়ত। তাই আমাদের মন্ত্রী আমাকে ডেকে বললেন, বাবাজী, ঝগড়া-ঝাটি করে কি লাভ? শহরের মেয়র নিজেদের লোক। এটা ওনার প্রেষ্টিজের ব্যাপার। শহরের ইঁদুর যদি ওনি নিজের কাছে রাখতে চান, তবে রেখে দিন। তুমি গ্রামে যাও। শুনেছি গ্রামেও ইঁদুর আছে।

আমি বললাম, থাকা ত উচিত। কিন্তু তা শহরের ইঁদুর থেকে ডবল বড় সড় এবং লড়াকু। এর জন্যে আমার আরও স্টাফ চাই।

—আরও স্টাফ নিয়ে নাও।

গ্রামে যাওয়ার জন্য দুটো জীপ চাই।

—দুটো জীপ নিয়ে নাও। কিন্তু এখন শহরের ইঁদুরের কথা ছেড়ে দাও। গ্রামের ইঁদুরের দিকে দৃষ্টি দাও।

আমি বললাম, শহরের ইঁদুরেরা খুব ভদ্র। ফ্যামিলি প্লানিং-এর কথা ওরা খুব সহজেই বুঝতে পারে। কিন্তু এই গোঁয়ার, গোয়া ইঁদুরদের বোঝানোর জন্যে আমাদের অনেক বেশি প্রপাগাণ্ডা করতে হবে।

মন্ত্রী খুব স্নেহের সঙ্গে বললেন, নতুন আর একটা প্যামপ্লেট তুমি ছাপিয়ে নাও। এখন আমার একটা নতুন ছবি এসেছে।

একদিন যখন সবকিছু যোগাড় যন্ত্র হয়ে গেল, তখন আমরা পেরেক আর কাটা দিয়ে ইঁদুরের পরিবার পরিকল্পনা আরম্ভ করার জন্যে গ্রামে

গেলাম। কিন্তু গ্রামের লোক আমাদেরকে গেটের কাছে ঘেঁষতে দিল না। রাস্তার মাঝখানে লাঠি সোটা নিয়ে আমাদের ঘিরে ফেলল।

ওদের সর্দার বলল: ইঁদুরের ফ্যামিলি পরিকল্পনা! কী বেকুব! জানো না, ইঁদুর যদি আমাদের খেতে না থাকত তবে ক্ষেতের অর্ধেক শস্য পোকামাকরে খেয়ে ফেলত? ইঁদুরই তো আমাদের খেতে গর্ত খুঁড়ে পোকামাকড় খেয়ে ফেলে—আর আমাদের ফসল রক্ষা করে। আমরা ওদের পরিবার পরিকল্পনা হতে দেব না। কোন মতেই হতে দেব না। এখান থেকে চলে যাও।

আমি নিজের মনে মনে বললাম, কী অদ্ভুত সমস্যা! আমরা যদি কুত্তার প্লানিং করি তবে ইঁদুর বেড়ে যায়। আর ইঁদুর খতম করলে পোকামাকড় বেড়ে যায়। কী, কী করা যায়?

আমরা গ্রাম থেকে পালিয়ে এলাম। কিন্তু কারো ধমক বা ভয়ে কী আমাদের পরিকল্পনা বন্ধ থাকতে পারে? এ তো সরকারী কাজ, হামেশাই চলতে থাকে।—এক পরিকল্পনা সফল না হলে তার জায়গায় আর এক পরিকল্পনা হবে।

শুনেছি আমাদের দপ্তর খুব শীগ্রই পোকা-মাকড়ের ফ্যামিলি প্লানিং-এর কাজ শুরু করবে। এই পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হচ্ছে আমাদের বিরোধীরা। তারা আমাদের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমেছে। কৃষি বিভাগ এক জোড়ালো প্রোটেষ্ট নোটে লিখেছে, এদেশের রেশম পোকার পরিবার পরিকল্পনা তারা কখনই হতে দেবে না। বহু সরকারী অফিসার এই প্রোটেষ্ট নোটকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বোধ হয় এই ভেবেই অভিনন্দন জানিয়েছেন যে সরকারী অফিসাররা এক ধরনের রেশম পোকা।

কিন্তু কারো ভয়ে বা হুমকিতে কী আমাদের ফ্যামিলি প্লানিং এর কাজ বন্ধ থাকতে পারে? নতুন প্যামপ্লেট ছাপা হচ্ছে নতুন বাজেট পাশ হয়েছে, নতুন ষ্টাফ রাখা হয়েছে। আর আমি এ বৎসরে নিজের মাইনে বেশ বাড়িয়ে নিয়েছি,—কারণ আমার ঘরে খুশির দিন আসছে।

॥ পাপ ॥

শঙ্করের যখন ঘুম ভাঙল তখন ভোরের আলো ঝুঁকে পড়া আমের মঞ্জরীর মধ্যে দিয়ে ঘরে এসে পড়েছিল। দরজা খুলে শঙ্কর প্রায় লাফিয়ে বারান্দায় গেল। হকার বারান্দায় খবরের কাগজ ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। ঝুঁকে পড়ে শঙ্কর কাগজটা তুলে নিল। কাগজ খুলতেই মোটা হরফের হেড লাইনের ওপর ওর চোখ পড়ল। চোখ পড়তেই ওর বুকটা ধক্ করে উঠল। তীরের গতিতে ওর চোখ জলে ভরে গেল। টলমল অশ্রু নিয়েই ও লাইনের ওপর চোখ বুলাতে লাগল এবং তা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করলো। কিন্তু ও কিছুই পড়তে পারল না। বারান্দায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

ঠিক এই সময় ওর স্ত্রী বালা চায়ের কাপ নিয়ে এল।

বালা বেশ রুষ্টভাবে ওকে বলল, এত রাত্রি পর্যন্ত লেকচার তৈরি করলে, তবুও তোমার চিন্তা শেষ হল না?

'হুঁ' না—কিন্তু—শঙ্কর অন্যমনস্কভাবে বিড়বিড় করে বলল।

বালা শঙ্করের হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, 'কিন্তু' কি? এত দেরিতে তো ঘুম থেকে উঠেছ, এখনও যদি চিন্তাই কর তবে তৈরি হয়ে আমাদের কখন বেড়াতে নিয়ে যাবে? মনে আছে তুমি কি বলেছিলে? আজ আমার কলেজ বন্ধ।

'কিন্তু।'

“আমি কোন কিন্তু টিন্তু শুনব না। তিন মাস হতে চলল তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে যাওনি। আজ তুমি কথা দিয়েছিলে, তোমাকে কিছুতেই ছাড়ছি না। বাচ্চারা সকাল থেকে সেজেগুজে বসে আছে। রঞ্জন, দেবী, কান্তা, তিনজনই তৈরি। তুমিও তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। দেখ, আজকের দিনটা কেমন সুন্দর, বলতে বলতে বালা শঙ্করের কাছে এসে দাঁড়াল।

শঙ্কর মাথা তুলে বাইরের দিকে তাকাল।

আজকের দিনটি অন্য দিনের মতোই নির্মল, স্বচ্ছ, কোমল এবং উত্তপ্ত, সুন্দর এবং উজ্জ্বল। আকাশে সূর্য ঝলমল করছিল। এখানে

ওখানে সাদা সাদা মেঘের ফালি পাখনা মেলে রাজহাঁসের মত মন্থর গতিতে সাঁতার কেটে চলেছিল।

কিছুক্ষন পরে শঙ্কর বাড়ির সবাইকে নিয়ে বাসে করে চৌপাটির দিকে যাচ্ছিল। ওরা সবাই শঙ্কর, তার স্ত্রী বলা, ছেলে রঞ্জন, বড় মেয়ে দেবী এবং ছোট মেয়ে কান্তা বাসের দোতালায় বসেছিল।

ছায়াবৃতা রাস্তার ওপর ঝুকে পড়া গাছের শাখা-প্রশাখাগুলো কখনও কখনও বাসের জানালার পাশ দিয়ে সর সর করে চলে যাচ্ছিল। রঞ্জন হঠাৎ জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা গাছ থেকে শুকনো আমের পাতা ছিঁড়ে নিল। আনন্দে চিৎকার করে ও ওর বাবাকে আমের পাতাটা দেখিয়ে বলল বাবা দেখ, সোনার পাতা।

শঙ্কর বলল, সোনার পাতা নয়, আমের পাতা।

কিন্তু এর রঙ তো সোনার মত। দেখ, রোদে কেমন ঝকমক করছে। বলতে বলতে রঞ্জন দু'আঙ্গুল দিয়ে পাতাটাকে ধরে জানালা দিয়ে আসা রোদে রেখে দিল। তারপর হাসতে হাসতে ও পাতাটাকে হাওয়ায় আলতোভাবে ছেড়ে দিল। হাওয়া পাতাটাকে নিজের কাঁধে নিয়ে নিল। আর পাতাটা নাচতে নাচতে বহু দূর চলে গেল। বাসও সামনের দিকে ছুটে চলল।

শঙ্কর কি যেন চিন্তা করছিল।

রঞ্জনের সামনের সিটে তার দু'বোন কান্তা আর দেবী বসেছিল। ও তাদের বলল, আমরা প্রথমে রাণীবাগ যাব।

কান্তা তার ছোট ভাই রঞ্জনকে বলল : না, আমার প্রথমে চৌপাটিতে যাব। বাবা চৌপাটির টিকিট নিয়ে নিয়েছেন।

রঞ্জনের কালো আর খাড়া খাড়া চুল অনেক কষ্টে আঁচড়ানো হয়েছিল, কিন্তু এখন আলুথালু হয়ে গিয়েছে। ওর চোখের কাজল লেপটে গিয়েছিল। ও শঙ্করের হাতের ওপর তার ছোট হাতটি রেখে জিজ্ঞেস করল, বাবা প্রথমে রাণীবাগ যাব না?

—'না প্রথমে চৌপাটি।' দেবী বেশ ক্রুদ্ধভাবে বলল। দেবী একটু কড়া মেজাজের মেয়ে।

রঞ্জন তার বড় বোনকে ধমকে বলল : 'না।' প্রথমে রাণীবাগ। রঞ্জনের মেজাজ দেবীর চেয়েও গরম।

বালা ওদের বলল : 'তোমরা দু'জনে চুপ কর।' বালা শঙ্করের বাচ্চাদের মা। ওর মেজাজ সব থেকে উগ্র। ও যখন জোরে চেঁচিয়ে উঠল তখন সমস্ত বাসের লোক ওকে দেখতে লাগল। কণ্ডাক্টর মিট মিট করে হাসছিল।

এখন পর্যন্ত কান্তা একটি কথাও বলেনি, এবার ওর বলার পালা। কান্তার সহজে রাগ হয়না। সবসময়েই ওর মুখে একটা হাল্কা হাসির রেখা লেগে থাকে। আর অন্যকে রাগায়। ধীরে ধীরে অন্যকে জ্বালাতন করে। হেসে বলল, এ বাস চৌপাটিতে যাচ্ছে, যাচ্ছে। চৌপাটির টিকিট কাটা হয়েছে, হয়েছে। রাণীবাগ যাবে না, যাবে না।

রঞ্জন রাগে এক ঘুষি মারল। কান্তাও সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জনের প্রতিউত্তর দিল। দেবী ওদের দু'জনকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ওরা দু জনেই দেবীকে মারতে লাগল। বালা তিনজনকেই চড় কষল। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল।

কণ্ডাক্টর বলল, কি, বাস থামাব?

'না ভাই, শঙ্কর খুব আস্তে বলল : এ তো রোজকার খেলাতামাশা। তুমি কতবার বাস থামাবে?

কণ্ডাক্টর বলল : আপনার বাচ্চারা খুব দুষ্টু?

—'হ্যাঁ ভাই, খুব দুষ্টু।'

বালা শঙ্করকে মুখ ঝামটিয়ে বলল, তুমি ওদের কিছু বল না। বলে এত বাড় বেড়েছে। সকাল থেকে দেখছি, এদের মাথায় চড়িয়ে রেখেছ। সব আব্দার শুনছ।

রঞ্জন আবার নেকিয়ে নেকিয়ে কাঁদতে লাগল, আমি, চোপাটি যাব না। রাণীবাগ যাব। আমি চৌপাটি যাব না, রাণীবাগ যাব।

শঙ্কর বাস কণ্ডাক্টরকে বলল, বাস একটু থামাও।

রাণীবাগে আফ্রিকার নানারকম গাছ, বাঘ, জিরাফ ও উটপাখি ছিল। আর ছিল বার্মার সাপ, বাংলাদেশের চিতাবাঘ, কাশ্মীরের খয়েরী

রঙের ভাল্লুক, ঝিল এবং হ্রদের কুমীর, জলে ডুব দিয়ে পয়সা খোঁজে এমন সীল, রঙ-বেরঙের পায়রা, ক্লার্কদের মতো শুকনো উট, নেতাদের মত হরদম কথা-বলা তোতা, আর আমীরের মত চালচলন পোষা শুয়োর।

উত্তর প্রদেশের শ্যামবর্ণ হনুমানও এখানে ছিল। হনুমানগুলো লেজ পেচিয়ে ঝুলছিল। টাংগানিকার লেজহীন বানরও ছিল। তাদের বক্তব্য বানর আর মানুষের মধ্যে শুধু যদি লেজেরই পার্থক্য হয় তবে আমাদের আবার চিড়িয়াখানা বন্ধ করে রেখেছ কেন?

এক কোণে একটা সাদা রঙের বানর তার সোনালী চুল রোদে শুকোচ্ছিল। রঞ্জন ওর দিকে বাদাম ছুঁড়ে দিল। ও সেদিকে ফিরে তাকাল না। বানরটি নীল চোখে মিটমিট করে বেশ গর্ব এবং উদাসীন ভাবে ডাট নিয়ে বসে রইল।

বাচ্চারা শঙ্করকে জিজ্ঞেস করল, বানররা তো বাদাম খায়, এ খাচ্ছে না কেন?

শঙ্কর বল্ল, হয়তো ওর পেটে কোন ব্যথা আছে। কিম্বা ও হয়তো কোন বিশুদ্ধ আর্য-জাতির বংশধর হবে, তাই কালো বাচ্চায় বাদাম খেতে নারাজ।

রঞ্জন ঘৃণার সংগে বলল, হু হু। তারপর সামনে এগিয়ে গেল।

খোলা-মেলা একটি জায়গায় বাশ ঝাড় লাগানো হয়েছিল। আর ছোট একটি বাগানে একটি চিতা বাঘ টান টান হয়েছিল। ওর সামনেই একটি মাদী চিতা তার বাচ্চাদের সংগে খেলা করছিল। ওর চোখে ঘুমের আমেজ ছিল। কখনও খুব আস্তে আস্তে গর-গর করে ডাকছিল আর হাত দিয়ে আলতো ভাবে ধাক্কা মেরে বাচ্চাদের নিচে নামিয়ে দিচ্ছিল। আর ওরা খেলতে খেলতে আবার ওর পিঠের ওপর উঠছিল। বাঁশ ঝাড়ের একটা কঞ্চির ওপর বসে একটা তোতা আর একটা তোতী টেঁ টেঁ করে রাণীবাগের দর্শকদের সামনে টিপপনী কেটে চলেছিল। আর ছিল খয়েরী রঙের ছোপ ছোপ চক্কর, সাত রঙের বাহারি ময়ূর, মধুর সংগীতজ্ঞ ময়না, আবাবিল, বুলবুলি আর আমাদের দেশে যার কোন নাম নেই ব্যোনিওর সেই বুটিওয়ালা পাখি। দেবী, কান্তা এবং রঞ্জন রাণীবাগের

এ সব কিছুই দেখল। রঞ্জনের চোখের কাজল আরও লেপটে গিয়েছিল। দেবীর দুটো বেনীই খুলে গিয়েছিল। ও ওর গোলাপী ফিতা ওর মার হাতে দিল। শংকরের স্ত্রীর হাতে ছিল গোলাপী রেশমী ফিতা, আর শংকরের হাতে কান্তার স্যাণ্ডেল। কারণ ঘাসের ওপর কান্তারি বেড়াতে ইচ্ছে করছিল। তিনটি ছেলে মেয়েই খুব খুশি ছিল। ওদের বাবা-মাকেও তাই খুশি খুশি দেখাচ্ছিল।

বালা শঙ্করের হাত ধরে আব্দারের সুরে বল্ল, বাচ্চাদের সংগে কিন্তু আজকে আমিও হাতির পিঠে চড়ব।

বালা এমন কোমল এবং আগ্রহের সংগে শঙ্করের দিকে তাকাল যেন ছোট্ট একটি মেয়ে ঘাড় উঁচিয়ে তার বাবাকে দেখছে। শঙ্করেরও তাকে ঠিক এক ছোট্ট মেয়ের মতোই মনে হল। শঙ্কর হেসে বলল, মানুষে কী বলবে! তিন বাচ্‌চার মা হয়ে...।

উঁহু লোকে আবার কি বলবে? অন্য মেয়েরাও তো চড়েছে। ঐ যে হাতি যাচ্ছে। দেখ কতগুলো বাচ্চা নিয়ে ওদের মা বসে আছে। আমিও বসব। আমি কোনদিন হাতির পিঠে চড়িনি।

শঙ্কর প্রসন্নতার সংগে বল্ল, ঠিক আছে ঠিক আছে।

ওরা হাতিতে ওঠার জন্য চলে গেল। শঙ্কর পাশেই ঝিলের আসমানী জলে প্রস্ফুটিত পদ্ম দেখতে লাগল। কাছেই এক ঝোপের পেছনে বারসিংগা দাঁড়িয়ে ছিল। বেহাগ রাগের লয়ের মত সুন্দর আর নম্র কোকন অঞ্চলের একটি মারাটি মেয়ে তার বেনী চাঁপা ফুলে সাজিয়ে তার ছোট হাতে ছোলা নিয়ে বারসিংগাকে খাওয়াচ্ছিল। এক হাতে সে ছোলা খাওয়াচ্ছিল আর এক হাতে সে আলতোভাবে তার মাথার ওপর হাত বুলাচ্ছিল। বারশিংগার শিং-এ নরম লোম ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন পুরানো পুকুরের পাথরের ওপর শেওলা পড়েছে। যখন ছোলা শেষ হয়ে গেল তখন বারসিংগা তার লাল জিভ বের করে ওর হাত চাটতে লাগল। শঙ্কর কুমারী মেয়ের মমতা-ভরা চোখ দু'টির দিকে অপলক তাকিয়েছিল। হঠাৎ এক প্রচণ্ড অট্টহাসি সমস্ত পরিবেশকে ঝরাবিলের মতো খানখান করে ভেঙ্গে দিল। শঙ্কর ফিরে তাকাল। দেখল, হাতি

থেকে নেমে রঞ্জন কান্তার চাকু হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে খুব জোরে হাসতে হাসতে শঙ্করের দিকে ছুটে আসছে। কান্তাও পেছনে পেছনে ছুটে আসছে।

—আমার চাকু দিয়ে দে।

—না দেব না।

—দিয়ে দে বলছি।

—দেব না।

দিব না? কান্তা রন্‌জনকে এক চর মারল।

রঞ্জনও এক চর মেরে বল্ল, দেব না।

দু জনে মারামারি করতে লাগল।

কান্তার বেনী খুলে গিয়েছিল। ওর ফ্রকে ময়লা লেগেছিল। রনজনের প্যান্ট থেকে ফুল মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। সবুজ এবং টক কুল দেখে বলার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল। বালা রনজনকে কানে ধরে দুই চর মারল। রন্‌জন চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। বালা রন্‌জনকে টেনে হিচড়ে কলের কাছে নিয়ে গেল। জল দিয়ে তার চোখে লেপটানো কাজল ধুয়ে দিয়ে কুলগুলি চৌবাচ্চার মধ্যে ফেলে দিল। রন্‌জন ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাদতে লাগল এবং চৌবাচ্চায় সবুজ হীরের মতে জ্বলেজ্বলে গোল কুলগুলির দিকে লোভী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল। আর ওর মা যতক্ষণ না ওকে গ্যাসভর্তি বেলুন কিনে দিল ততক্ষন ও চৌবাচ্চার কাছ থেকে এক চুলও নড়ল না।

বেলুন নিয়ে ও টক কুলের কথা ভুলে গেল। এদিকে ওদের মা কান্তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাল—মাত্র এক দিনের জন্য ওই চাকু রন্‌জনের কাছে থাকবে। কান্তা রাজী হয়ে গেল।

রঞ্জনের হাতে লম্বা সুতো ছিল। সুতোর মাথায় বেলুন উড়ছিল। বেলুনে গ্যাস ভরা ছিল বলে উড়ছিল। চকে চার-চারটি ফোয়ারা ছিল। তার ওপর দাঁড়িয়ে দেবী, রঞ্জন এবং কান্তা ঘুড়ির মতো বেলুন উড়াচ্ছিল। ফোয়ারার অনেক উপরে বেলুন হাওয়ায় ভাসছিল। রঞ্জন নিজের বেলুনটাকে বুটকা টান দিয়ে দিয়ে মাঝের সবচেয়ে উঁচু ফোয়ারার

ওপর আনার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ ফোয়ারার ধারা লেগে বেলুন কেটে গেল।

রঞ্জন আনন্দে চীৎকার করে উঠল।

চৌপাটিতে খুব ভীড় ছিল। কান্তা তার মার হাত ধরেছিল। শঙ্কর, দেবী আর রঞ্জনকে সামলাচ্ছিল। চারদিকে অসংখ্য কাচ্চা-বাচ্চা মহিলা এবং পুরুষের ভীড়। বালির ওপর ঢাকা পলাশ পাতা বিছিয়ে মহিলার এক হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার করছিল। এক জায়গায় সাত-আটজন বাচ্চা একসংগে কাগজের বাশী বাজাচ্ছিল। কেউ বা সবুজ আর লাল রঙের চশমা কিনছিল, আবার কেউ বা কাগজের কচ্ছপ, ব্যাঙ এবং মাছ সুতোয় বেধে সমুদ্রের ধারে দৌড়াচ্ছিল। অমৃতস্বরের এক নব দম্পত্তি কুলফির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আইসক্রীম খাচ্ছিল। তারা তাদের প্লেট থেকে চামচ দিয়ে আইসক্রীম তুলে মুখে দেওয়ার সময় পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

শঙ্করের স্ত্রী প্রায় ফিসফিস করে বলল প্রায় চার মাসের।

শঙ্কর চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি করে জানলে?

'যা, আমি বুঝি মা হইনি? বালা নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে বেশ গর্বের সংগে বলল. তারপর দেবীকে দু হাতে তুলে নিয়ে চুমু খেল।

বালা শঙ্করের হাত ধরে বলল, আজ আমি পুরি খাব।

—ডাক্তার তো তোমায় নিষেধ করছেন?

—শুধু আজকেই।

—বেশ।

—চাট...দই-বড়া আর

— আচ্ছা, আচ্ছা সিংগাড়া, বার মশলার চাট, জিরা জলের আম পাপড়াও খেও।

শঙ্করের স্ত্রী অভিভূত হয়ে শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কি ব্যাপার বলতো? আজ দেখছি আমার সমস্ত কথা শুনছ। তোমাকে আজ অন্যরকম লাগছে।

শঙ্কর শুধু হাসল। ওর চোখের সামনে সংবাদপত্রের হেড লাইন আবার ভেসে উঠল।

শঙ্করের স্ত্রী প্রসন্নতার দীর্ঘশ্বাস দিয়ে বলল, আজকের দিনটি খু-উ-ব সুন্দর।

আজকের দিনটি সত্যিই সুন্দর ছিল। পরিস্কার উজ্জ্বল, নীল ঝকমকে সোনালী এবং আনন্দে পরিপূর্ণ। সমুদ্রের ধারে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা গাধা আর ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়াচ্ছিল। এক চীনা বাজীকর ভীড়ের মধ্যে দাড়িয়ে তার আশ্চর্য খেলা দেখাচ্ছিল। নব বিবাহিত যুবক কুলফির দোকান থেকে এখন ফলের দোকানের সামনে এসে দাড়িয়েছিল। তারা কমলা আর ডালিমের রস মিলিয়ে খাচ্ছিল। বাচ্চাদের হৈ হট্টোগোলের মধ্যেও মাঝে মাঝে মাল্লাদের গানের সুর ভেসে আসছিল।

সূর্য যখন পশ্চিম দিগন্তে হেলতে লাগল তখন ওরা বাড়িতে পৌছল। শঙ্করের স্ত্রী টেবিলের উপর কফি রেখে বারান্দার বড় বড় জানালা দুটি খুলে দিল। নারকেল গাছের ঝিরঝির পাতার ফাক দিয়ে আসা পড়ন্ত সূর্যের কিরণে মেঘের দল নারংগী রঙের শিবির গেড়ে বসেছিল। আর পাথর ভেংগে যে মজদুর মেয়েরা ঘরে ফিরছিল তাদের গান গাওয়া নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে ছুটে চলছিল। সারা ঘর সুখ আর আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল। শঙ্করের স্ত্রী মধুর আবেশে তার মাথা স্বামীর কোলে রেখে বলল :

আজকের দিনটি সত্যিই খুব সুন্দর। তোমাকে আজ বড় অচেনা লাগছিল। মনে হচ্ছিল প্রেমের অথৈ সাগরের সুন্দরতা, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। যদি আজকের মতো তুমি প্রতিদিন এমনই থাক, তবে তোমার মত স্বামী আমি সারা দুনিয়ায় খুজেও পাব না।

শঙ্কর মৃদু কণ্ঠে বলল, হ্যা, আজকে আমার ব্যবহার খুব ভালো ছিল। আজ আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিনি, বাচ্চাদের ওপরও রাগ করিনি। আজ সকাল থেকেই আমি তোমার সঙ্গে আছি। এর কারণও তুমি জানো?

বালা শঙ্করের কোল থেকে মাথা তুলে খুব আশ্চর্যের সঙ্গে বলল না তো?

শঙ্কর দুঃখের আবেগে বলল, আজ এথেল রোজেনবার্গ আর তার স্বামীকে ফাসি দেওয়া হয়েছে।

'কি।' বালা নিজেকে কোন রকমে সামলিয়ে নিয়ে উঠে বসল। রঞ্জন রেডিওগ্রামে রেকর্ড বাজাচ্ছিল। রেকর্ড হাতে করে ও শঙ্করের কাছে এগিয়ে এল। শঙ্কর বলল, আজ দু'জন নিরাপরাধ নিরীহ মানুষকে ফাসি দেওয়া হয়েছে।

কান্তা তার বাবাকে বলল, বাবা, কিন্তু ওদের কি অপরাধ ছিল ?

নিউইয়র্ক শহরে মনরো ষ্ট্রিট নামে যে মহল্লা আছে সেই মহল্লায় রোজেনবার্গ নামে এক মহিলা থাকতেন। তার বয়স ছিল চৌত্রিশ বৎসর। স্বামীর নাম জুলিয়াস রোজেনবার্গ। তাদের দুটি সন্তান ছিল বড় বড় নীল গভীর চোখ যার তার নাম রোবি, আর সুন্দর রোদ্রের মতো প্রাণবন্ত হাসি -মাইকেল। এই ছোট্ট আমেরিকান পরিবারের মানুষরা নিউইয়র্ক শহরে শান্তি এবং সুখী জীবন অতিবাহিত করছিল।

জুলিরাস রোজেনবার্গ ছিল একজন ইঞ্জিনিয়ার। তার একটা ছোট কারখানা ছিল। দিনরাত সে এই মেশিনশপে কাজ করে পরিবারের সবার ভরণ পোষুন করতেন। তাঁর স্ত্রী এথেল নিজের ঘর আর শিশু সন্তানের দেখাশুনা করতেন। মাঝে মাঝেই তাঁদের বেশ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এথেলের মুখে হাসি লেগেই থাকত। কারণ তাঁর স্বামী ছিলেন পরিশ্রমী এবং তাঁকে ভালবাসতেন।

এই ছোট্ট সংসারে ডেভিড গ্রীনগ্রাম নামে একজন লোক মাঝে মধ্যেই আসত। ডেভিড ছিল এথেলের ছোট ভাই। এই লোকটি ছিল জাত ভবঘুরে। মহাযুদ্ধের সময় ডেভিড কয়েকবার সেনাবাহিনীর জিনিসপত্র চুরি করে। এই অর্ধশিক্ষিত সাধারণ মেকানিক লোকটি নিজের বদ অভ্যাসের জন্যে প্রায়ই বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে ফেসে থাকত। ও বহুবার তার বোনাই জুলিয়াসের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে। ধার নিয়ে আবার নির্লজ্জের মতো জুলিয়াসের কাছে ধার চাইতে আসত। এই ব্যাপার নিয়ে দু'জনের মধ্যে মন কষাকষি হয়। এমন কি ঝগড়াঝাটিও হয়। একবার ডেভিড জুলিয়াসের কাছে চার হাজার ডলার ধার চায়। কিন্তু জুলিয়াস তাকে ধার দিতে অস্বীকার করে। তখনও বলে, বেশ একদিন টের পাবে।

এ ঘটনা ঘটে উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের জুন মাসে। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই জুলিয়াস এবং তাঁর স্ত্রী এথেলকে গ্রেফতার করা হয়। ডেভিড আমেরিকান সরকারের কাছে জবানীতে বলে, ও স্বয়ং একজন গুপ্তচর। নিজের দেশের সেনাবাহিনীর গুপ্ত দলিল দস্তাবেজ ও বিদেশে পাচার করে। জুলিয়াস রোজেনবার্গ এবং এথেল রোজেনবার্গের পরামর্শ মতো ও তার স্ত্রী রুথের সহযোগিতায় 'লস অলামাস প্রোজেক্ট' থেকে পরমাণু শক্তি সম্পর্কিত তথ্য চুরি করে এথেল রোজেনবার্গ এবং জুলিয়াস রোজেনবার্গকে দেয়। আর তাঁরা এ তথ্য সোভিয়েত রাশিয়ায় পাচার করে।

ডেভিড সরকারী সাক্ষী হয়ে যায়। তার স্ত্রী রুথকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এথেল রোজেনবার্গ এবং জুলিয়াস রোজেনবার্গকে ফাসির আদেশ দেওয়া হয়। ভাই, বোন এবং বোনাই এর প্রাণ নিয়ে নেয়।

এই খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে তুমুল আলোড়ণ সৃষ্টি হয়। অভিযোগের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত এবং সমঝদার মানুষ ভালভাবেই বুঝতে পারল এসব অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। এথেল এবং জুলিয়াসকে বলির পাঁঠা বানানো হয়েছে।

দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল করা হয়। জজ তাঁর নিজের বিচার বিবেচনায় লেখেন, যদি সরকারী সাক্ষীর ওপর বিশ্বাস না করা যায় তবে অপরাধ প্রমাণিত হয় না।

আর সরকারী সাক্ষী ডেভিড গ্রীনগ্রাম তার জবানীতে বলে, আমি উনিশ শ পয়তাল্লিশ সালে পরমাণু বোমার নক্শা এবং টেকনিক্যাল তথ্যের বারো পৃষ্ঠা জুলিয়াস রোজেনবার্গকে দিয়েছি। এই সমস্ত তথ্য আমার সাধারণ শিক্ষার সাহায্যে আমার স্মরণ শক্তির সহায়তায় তৈরি করেছিলাম।

এই বয়ান সম্পর্কে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ব্যঙ্গ করে বলেন, ডেভিডের এই বক্তব্য এত খাটি যেন তার কথা শব্দের গতির চেয়েও তীব্র গতিতে দৌড়াতে পারে।

অভিযোগের প্রারম্ভে সরকারী উকিল অপরাধকে প্রমাণিত করার জন্যে এক'শ তেরোটি সাক্ষীর নাম আদালতে পেশ করেন। সেই সাক্ষীর মধ্যে ছিল—

(১) বিশ্ববিখ্যাত পরমাণু বৈজ্ঞানিকদের নাম,

(২) এফ. বি. আই. (আমেরিকান গুপ্তচর পুলিশ)-এর উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিরা,

(৩) কেস যারা পরিচালনা করছিল পুলিশের সেই উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের নাম এবং

(৪) রোজেনবার্গের সেইসব বন্ধুদের নাম যারা গুপ্তচর বৃত্তিতে রোজেনবার্গ দম্পতিকে সহযোগিতা করত।

পরে অবশ্য এই সাক্ষীদের কাউকেই আদালতে পেশ করা হয়নি। কেবল সরকারী সাক্ষী এবং তার স্ত্রীর বয়ানকেই যথেষ্ট ধরা হয়।

কিন্তু এই পরমাণু বোমা সম্পর্কিত গুপ্ত রহস্য বাস্তবে কতখানি গুপ্ত ছিল? এই সম্পর্কে আমেরিকার পরমাণু শক্তি কমিশনের রিপোর্টে (যে রিপোর্ট ডিসেম্বর ১৯৪৭-এ অর্থাৎ অভিযোগ শদর্পের কয়েকমাস পূর্বে হয়েছিল বলা হয়েছিল :

পরমাণু শক্তি কমিশন যে গুপ্ত দলিলসমূহ পেশ করেছে তাতে সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৪৭ সালেই পরমাণু বোমা তৈরির গুপ্ত রহস্য জ্ঞাত হয়েছে।

উনিশ শ পঞ্চাশ সালে প্রকাশ করার অপরাধে দুজন নিরপরাধ মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

ফাঁসি কি শুধু অপরাধীদেরই দেওয়া হয়?

না, কখনও কখনও নিরীহ মানুষকেও ফাঁসির মঞ্চে তুলে দেওয়া হয়।

কিন্তু কেন?

কখনও বা কোরিয়া যুদ্ধ শুরু করে দেয়, আর লক্ষ লক্ষ আমেরিকান যুবককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। কখনও বা হিরোশিমার ওপর বোমা নিক্ষেপ করে আর সারা দুনিয়ার সামনে গলা ফাটিয়ে নিজের পরমাণু শক্তির এবং বোমার ঠিকাদারীর কথা ঘোষণা করে। কিন্তু যখন অত্যাচার প্রতিরোধ করা হয় এবং অন্য দেশের বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের নিজস্ব শক্তি এবং মেধার সাহায্যে প্রকৃতির রহস্যকে উদঘাটিত করেন তখন কারো ওপর ক্রোধ হওয়া তো স্বাভাবিক। তখন কাউকে বলির পাঁঠা বানানো

গুলিটি আমার মাথায় বিদ্ধ হয়েছে।

— তুমি কি চাইছ ?

—কিছুই চাইনা, শুধু আপনার ছত্রছায়ায় একটু দাঁড়াতে দিন। আমি আপনার পাশে দাঁড়িয়ে সারা দুনিয়াকে আমার মাথায় এই লাল নিশানা দেখাতে চাই। দাদাভাই, আমার মাথায় এই লাল নিশানা দেখতে চাই। দাদাভাই, আমার মাথায় এই রক্ত কি কোনদিন বন্ধ হবে না ? আমার বুড়ো বাপকে কেউ কি রুটি দেবে না ? আমার স্ত্রীকে কেউ লজ্জা নিবারণের জন্যে এক টুকরো কাপড় দেবে না ? আমার মার মমতা কি পিপাসার্তই থাকবে ? দাদাভাই, দাদাভাই, বলুন আপনি তো পার্লামেণ্টে বাঘের মত গর্জন করতেন। এখন কেন চুপ করে আছেন ?

আমার চোখ জলে ভরে উঠল, এরপর আমি আর কিছুই শুনতে পারলাম না। আমি ঐখান থেকে চলে এলাম। কাঁদতে কাঁদতে এ. আই. সি. সি-র প্যাণ্ডেলের সামনে যেখানে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি ছিল সেখানে এসে দাঁড়ালাম। এ. আই. সি. সি-র অধিবেশন শেষ হয়ে গিয়েছিল। দর্শকরাও চলে গিয়েছিল। প্যাণ্ডেল খোলা হচ্ছিল, আমি মূর্তির কাছে এগিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম ঃ

বাপুজী দেখ, তোমার রাম রাজ্যে কি অত্যাচার চলছে। লেংটি পরা বাপু। আমি তোমাকে দেখাচ্ছি, তোমার পুজারীরা তোমার নামে কি করছে।

কিন্তু মূর্তি আমার কোন জবাব দিল না। কারণ অমাবস্যার রাত্রি শেষ হয়ে গিয়েছিল, আর রক্তিম সূর্য উদিত হচ্ছিল। ভোর হয়ে গেলে মূর্তি আর কথা বলে না।

আমার পাশেই একজন শ্রমিক দাঁড়িয়েছিল। সে আমাকে বলল, চবুতরের কাছ থেকে সরে যাও, এই মূর্তিকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় ? ও বলল, এক মিল মালিক এটা কিনেছে, মূর্তি আজ তার ঘরে উঠে যাবে।

।। মন্ত্রীর অসুখ ।।

৫ই ফেব্রুয়ারি, 'টাইমস'-এর প্রথম পৃষ্ঠায়।

ভূষি প্রান্তরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জি. জি. গজানন্দ আজ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি নিজে সরকারী বাংলার বারান্দায় বসে তরমুজ খাচ্ছিলেন। এতো বেশি তরমুজ তিনি খেয়ে ফেলেছিলেন যে হঠাৎ তার পেটের ব্যথা ওঠে—আর তিনি সঙ্গে সঙ্গে 'হায়' বলে বেহুশ হয়ে পড়েন। কিন্তু অচেতন হওয়ার আগে তিনি অন্ততঃ এতটুকু জরুরী কথা বলেন যে, তাঁর পোর্টফোলিও অন্য কাউকে দেবেন না।

৬ই ফেব্রুয়ারি, 'ক্রনিকল'-এর প্রথম পৃষ্ঠায়।

ভূষি প্রান্তরের মুখ্যমন্ত্রীর অসুস্থতার খবর প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সাতজন বড় বড় ডাক্তারকে ডাকা হয়। তাঁর পেটের বৃদ্ধি এবং অবস্থা দেখে ডাক্তার মত দেন যে, শ্রীযুক্তর চিকিৎসার কোন ভেটারনারী সার্জনের প্রয়োজন। তাই রাজধানীর সবচেয়ে বড় ভেটারনারী সার্জেন ডাঃ এস. কে. গোধর, ডি, ডি, টি, বি, আই, পি-কে স্পেশ্যাল চাটার্ড প্লেনে করে ভূষি নগরে পাঠানো হয়েছে। হাই কমাণ্ড এজন্য বিশেষ চিন্তিত যে মুখ্যমন্ত্রী অসুস্থ হওয়ার সত্তেও তাঁর পোর্টফোলিও অন্য কারো ওপর ন্যাস্ত করা হচ্ছে না কেন?

আজ ভুষি প্রান্তরের আর একজন বড়নেতা ভ. ভ. ভূজানন্দ রাজধানী অভিমুখে রওনা হয়েছেন। শ্রী গজানন্দ অসুস্থ হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত শ্রীভুজানন্দকে শ্রীগজানন্দের দক্ষিণ হস্ত বলে মনে করা হত। শোনা যাচ্ছে তিনি হাই কমাণ্ডারকে এই বলতে গিয়েছেন যে, শ্রীগজানন্দের পরিবর্তে যদি শ্রীভূজানন্দকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়, তবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অবশ্য সাত বছরের মধ্যে সমাপ্ত হবে—আর শ্রীগজানন্দ তা দশ বৎসরে সমাপ্ত করার ওয়াদা দিয়েছেন।

৭ই ফেব্রুয়ারি, স্ট্যাণ্ডার্ড-এর প্রথম পৃষ্ঠায়।

শ্রী জি. জি. গজানন্দ এখনও অচেতন আছেন, কিন্তু তাঁর পোর্টফোলিওর কাজ এ জন্য আটকে থাকছে না। অচেতন অবস্থায় তার মুখ থেকে যা বের হচ্ছে, তা চিফ সেক্রেটারি সঙ্গে সঙ্গে নোট করে নিচ্ছেন—আর সেই নোট এক জ্যোতিষীর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এই জ্যোতিষী সাত বৎসর ধরে শ্রী, জি, জি, গজানন্দের জ্যোতিষী। তিনি প্রখর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের কাজে চালাচ্ছেন।

৮ই ফেব্রুয়ারি, 'এক্সপ্রেস'-এর প্রথম পৃষ্ঠায়।

শ্রী. গজানন্দ এখন পর্যন্ত অচেতন—পোর্টফোলিওর কাজ নিয়মানুসারে চলছে। চীফ ভেটারনারি সার্জেন এস. কে. পোখয়কে সহযোগিতা করার জন্যে অস্ট্রেলিয়া থেকে মিঃ ওলেনকে আনা হচ্ছে। মিঃ ওলেন অস্ট্রেলিয়ার ভেড়ার অসুখের একজন বিশেষজ্ঞ। মিঃ ওলেন রোগিকে দেখার পর খুব আশ্চর্যের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন, এর এই রোগ কি করে হল, এ রোগ তো অস্ট্রেলিয়ার ভেড়াদের হয়। আর এই রোগ সেই সব ভেড়াদেরই হয় যাদের লোম খুব মোটা এবং ত্বকের গভীর পর্যন্ত থাকে। গজানন্দের শরীরে প্রচুর লোম আছে সত্য, কিন্তু এই লোম উল নয়—সে এ জন্য খুবই তাজ্জবের ব্যাপার।

৯ই ফেব্রুয়ারি, 'টাইমস'-এর প্রথম পৃষ্ঠায়!

ভুষি অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী লাগাতার অচেতন অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও আঞ্চলিক কেবিনেট যে ঢং-এ পরিচালিত হচ্ছে তাতে কেন্দ্রীয় হাই কমাণ্ড ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন যে, অন্যান্য অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদেরও যদি অচেতন করা যায় তবে কাজ কতো দ্রুত গতিতে এগুবে। 'অচেতন দেশ'—এর প্রস্তাব সম্পর্কে খুব গভীর চিন্তা করা হচ্ছে।

১০ ই ফেব্রুয়ারি, 'টাইমস'-এর চতুর্থ পৃষ্ঠায়।

ডাঃ ওলেন অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে গিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই রহস্যময় অচেতনতার চিকিৎসার ব্যবস্থাই তিনি করতে পারেননি। তাঁর ঘোষণা রোগীর এই অসুখ কোন ভেড়ার রোগ নয়, সম্ময়ের যে রোগ হয় এ তাই-ই। ডাঃ ওলেন সম্ময়ের রোগের চিকিৎসক নন. তাই তিনি ফিরে গিয়েছেন।

এখন ভূষি অঞ্চলের সাতজন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারকে নিয়ে একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তাঁরা শ্রীগজানন্দের বিষয়ে প্রতিদিন একটি বুলেটিন প্রকাশ করবেন। এই মেডিক্যাল বোর্ডে চিফ ভেটারনারী সার্জেন শ্রী এস, কে. পোখার ছাড়া ডাঃ খারাপানিকর এম. ডি; ডাঃ সোডাওয়ালা আর. এস. বি. সি; ডাঃ দুবধা রায় কিউ, ইউ, ডি, এবং মিস ঘাসলেটম আছেন। মিস ঘাসলেটম মার্গ সঙ্গীত দ্বারা বিভিন্ন চিকিৎসা করেন। শোনা যায় তাঁর সঙ্গীতে রোগ পালায়।

১২ ফেব্রুয়ারি, 'আবজারভার'-এর সপ্তম পৃষ্ঠায়।

শ্রীগজানন্দের অবস্থা বড় সঙ্গীন! পোর্টফোলিওর জন্যে শ্বাস-প্রশ্বাস কম হচ্ছে কিন্তু নাক বেশি ডাকছে। এমন জোরে নাকি ডাকছে যে সারারাত্রি নাকের জেগে থাকার কোন আপত্তি নেই।

গত রাত্রে মিস ঘাসলেটম কর্ণাটক মিউজিক শুনিয়েছেন। কিন্তু মিউজিক রোগীর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। উনি এখন অচেতন আছেন।

স্বাক্ষর

ডাঃ মিস খাসলেটম
ডাঃ সোড়াওয়ালা
ডাঃ খারাপানিকর
ডাঃ দুবধা রায়
ডাঃ কর্নেল গোমসো বক্স
ডাঃ হয়রানী চক্করখানি
ডাঃ এস. কে. পোখর (ভেটেরনারী সার্জেন)

১১ ফেব্রুয়ারি, 'এক্সপ্রেস'-এর সপ্তম পৃষ্ঠায়।

যেদিন থেকে মুখ্যমন্ত্রী অচেতন হয়ে পড়েছেন সেদিন থেকেই তার পেট ক্রমান্বয়ে ফুলে চলেছে। ডাঃ সোড়াওয়ালার অভিমত, রোগী গর্ভবতী কিন্তু রোগী মহিলা নন, পুরুষ। সুতরাং তিনি কিভাবে গর্ভবতী হবেন। ডাঃ সোডাওয়ালা ফরাসী মেডিক্যাল জার্নালের উদাহরণ দিয়ে বলেন,

বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পুরুষও গর্ভবান হয়। তাঁর বক্তব্যে মিস ঘাসলেটম ক্রোধান্বিত হন এবং মেডিক্যাল বুলেটিনে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেন। তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন, পুরুষেরা জোরপূর্বক মহিলাদের বিভাগে ঢোকার চেষ্টা করছে।

আজ মিস ঘাসলেটম রোগীকে ইমনকল্যান খেয়াল শুনিয়েছেন। শুনতে শুনতে রোগী আরো বেহুশ হয়ে পড়েছেন – অবস্থা খুব সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। লণ্ডন থেকে স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ টাইমস বার্থকে আনা হয়েছে।

১৩ ফেব্রুয়ারি, 'ষ্টাণ্ডার্ড'-এর নবম পৃষ্ঠায়।

ডাঃ হুবধা রায়ের অভিমত রোগী 'গর্ভবান' নন। রোগীর পেটে ভাষণ ফেটে গিয়েছে। অচেতন হওয়ার পূর্বে রোগীর ভাষণ দেওয়ার রোগ ছিল। এখন অচেতন হওয়ার জন্য ভাষণ কণ্ঠ দিয়ে বের হচ্ছে না। ফলে ভাষণ আবার পেটের মধ্যে ফিরে গিয়েছে। পেটের মধ্যে গিয়ে তা জোটবদ্ধ হচ্ছে, সেই জন্যে রোগীর পেট বেলুনের মত ফুলে যাচ্ছে।

ডাঃ হুবধা রায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, রোগী যদি এইভাবে অচেতন থাকেন এবং ভাষণ দিতে না পারেন – তবে শীঘ্রই পেট ফেটে তাঁর মৃত্যু হবে।

১৪ ফেব্রুয়ারি, 'টাইমস'-এর প্রথম পৃষ্ঠায়।

মুখ্যমন্ত্রীর পেটের অপারেশন – ভাষণ বেরিয়ে যাবে।

ভুষি অঞ্চলের সেক্রেটারিয়েট এক ঘোষণায় জানিয়েছে, আজ সন্ধ্যা পাঁচটায় মুখ্যমন্ত্রীর পেট অপারেশন হবে। পেটের বাইরে এক মাইক্রোফোন রাখা হবে এবং মাইক্রোফোনের এক টিউব পেটের মধ্যে দেওয়া হবে। এই পদ্ধতিতে পেটের ভেতর থেকে ভাষণ বের করা হবে। হাজার হাজার জনতা সরকারী হাসপাতালের বাইরে জমায়েত হচ্ছেন। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর এই ভাষণ নিজের হৃদয়ে এমন কি পেটেও স্থান দিতে পারেন – যে পেটের একটি দিক খালি আছে।

১৫ ফেব্রুয়ারি, 'অবজারভার'-এর প্রথম পৃষ্ঠায়।

বিশ্বে প্রথম ভাষণযুক্ত পেটের অপারেশন। মুখ্যমন্ত্রীর পেট থেকে তিনশো ভাষণ বের হয়েছে। ডাঃ টাইমস ব্যর্থ-এর অবিস্মরণীয় অপারেশন।

১৬ ফেব্রুয়ারি, 'এক্সপ্রেস'-এর তৃতীয় পৃষ্ঠায়।

ডাক্তারের বুলেটিনে ঘোষিত হয়েছে রোগীর অবস্থা ভালো।

১৭ ফেব্রুয়ারি, 'টাইমস'-এর দশম পৃষ্ঠায়।

অবস্থা ভালো না।

১৫ ফেব্রুয়ারি, 'টাইমস-এর দশম পৃষ্ঠায়।

আজ ভুখি অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী দু' আউন্স খিচুড়ি এবং দেড় আউন্স মুসুর-ডালের জল খেয়েছেন। নিজের বেডে শুয়ে তিনি রেডিও-র জন্যে সতেরো পৃষ্ঠার এক ভাষণ ব্রডকাষ্ট করেন।

এই ভাষণে তিনি শ্রীভ. ভু. গজানন্দের নাম উল্লেখ না করে বলেন যে, তাঁর অসুস্থাতার সুযোগ নিয়ে উনি তাঁকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর দৃঢ়বিশ্বাস, এমন একজন ধোকাবাজ থেকে জনসাধারণ দূরে থাকবেন।

২০ ফেব্রুয়ারি, 'ষ্টাণ্ডার্ড'-এর তৃতীয় পৃষ্ঠায়।

আজ ভুখি প্রান্তরের মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, তাঁর অসুস্থতার আগেই তিনি বহু তরমুজ উগলে বের করেছেন। তিনি বলেন, যখন তরমুজ ফালি ফালি করে তিনি জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করতে যাচ্ছিলেন তখনই হঠাৎ তাঁর পেটে ব্যথা ওঠে তাঁর পেটে যে ব্যথা ওঠে, আসলে তা জনসাধারণের জন্যে সমদরদের দরদ। (সমদরদের দরদ দেখুন।)

মুখ্যমন্ত্রী আজ তাঁর রোগশয্যায় পনেরো মিনিটের জন্যে উঠে বসেন। আজকে সকালে নাস্তায় তাঁকে ভেণ্ডিভাজা দেওয়া হয়েছে। দুপুরে তাঁকে 'দু' আউন্স অরহর ডালের জল খাওয়ানো হয়েছে—এবং রাত্রে আধ আউন্স

বোথুরা শাক দেওয়া হয়েছে। এরপর তিনি অঙ্গীকার করেন, যদি কোনো দেশ তাঁর দেশের ওপর হামলা করে তবে তিনি সেই দেশের ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নেবেন।

২ মার্চ, ‘এক্সপ্রেস’-এর এগারো পৃষ্ঠায়।

ডাক্তারদের বুলেটিনে বলা হয়েছে, আজ ভুষি অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী নার্সিং হোম থেকে নিজের বাসভবনে ফিরে এসেছেন। নার্সিং হোমের ডাক্তাররা তাঁকে খুব ভালোভাবে মেডিক্যাল চেকআপ করেছেন। তাঁর শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ। হৃদয়, মন, পেট, ফুসফুস, যকৃত, —সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই সুস্থ এবং খুব ভালো ভাবে কাজ করছে। ডাক্তাররা শ্রী জি. গজানন্দকে আশ্বাস দেন, তিনি এখন এ্যাসেম্বলির বৈঠকে যোগ দিতে পারেন।

৩ মার্চ, ‘ষ্ট্যাণ্ডার্ড’-এর অষ্টম পৃষ্ঠায়।

আজ মেডিক্যাল বোর্ড ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল মুখ্যমন্ত্রী ভূষি প্রান্তরের এ্যাসেম্বলিতে যোগ দেবেন এবং সেখানে নিজের পার্টির সদস্যদের কাছে শ্রী ভ. ভ. ভূজানন্দের পার্টি শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য পার্টি বহিষ্কারে প্রস্তাব আনবে।

৪ মার্চ, ‘টাইমস’-এর প্রথম পৃষ্ঠায়।

আজ এ্যাসেম্বলিতে রওনা হওয়ার সময় শ্রী জি. জি. গজানন্দ হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যান।

শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়েছে। এবং তরমুজ বিক্রির ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

শ্রী ভ. ভ. ভুজানন্দ হাই কমাণ্ডের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের জন্যে রাজধানী অভিমুখে রওনা হয়েছেন।

।। জাম গাছ ।।

রাত্রে প্রচণ্ড ঝড় হয়ে গিয়েছে। সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর লনের জাম গাছটা সেই ঝড়ে উপড়ে পড়েছে। ভোরে মালি দেখতে পেল গাছটার নিচে একজন মানুষ চাপা পড়ে আছে।

মালি ছুটতে ছুটতে চাপরাসির কাছে গেল—চাপরাসি ছুটতে ছুটতে ক্লার্কের কাছে গেল— ক্লার্ক ছুটতে ছুটতে সুপারিনটেনডেণ্টের কাছে গেল। সুপারিনটেনডেণ্ট ছুটতে ছুটতে বাইরের লনে এলেন। দেখলেন ঝড়ে উপড়ে পড়া গাছের নিচে যে মানুষটি চাপা পড়ে আছে তার চারিদিকে বেশ ভীড় জমেছে।

একজন ক্লার্ক আক্ষেপ করে বলল : আহা, এই জাম গাছে কতই না ফল ধরত।

আর একজন ক্লার্ক তাকে মনে করিয়ে দিল, আর এর জাম কী রসেই না ভরপুর ছিল।

তৃতীয় ক্লার্কটি বলল : ফলের মৌসুমে আমি ঝোলা ভর্তি করে এই ফল নিয়ে যেতাম। আমার বাচ্চারা কত আনন্দেই না এই জাম খেত।

মালি গাছের নিচে চাপ-পড়া মানুষের দিকে ইশারা করে বলল, আর এই মানুষ?

হাঁ, এই মানুষ...। সুপারিনটেনডেণ্ট খুব চিন্তায় পড়লেন। একজন চাপরাসি জিজ্ঞেস করলে, জানি না এ বেঁচে আছে না মরে গেছে।

অন্য একজন চাপরাসি বলল, বোধ হয় মারাই গেছে। এত ভারী গাছ কোমরের ওপর পড়লে কি মানুষ বাঁচতে পারে?

গাছের নিচে চাপা পড়া মানুষ বেশ রুক্ষ স্বরে বলল : না, আমি বেঁচে আছি।

একজন বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, আরে বেঁচে আছে!

মালি প্রত্যেকের উদ্দেশ্য করে বলল, গাছটিকে সরিয়ে মানুষটিকে এর নিচ হইতে তাড়াতাড়ি বের করতে হবে।

একজন ফাঁকিবাজ হৃষ্টপুষ্ট চাপরাসি ভারিক্কিচালে বলল, মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অতো সোজা নয়। গাছের গুঁড়িটি বেশ ভারিই হবে।

মালি জিজ্ঞেস করল, সোজা নয় কেন? সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেব যদি হুকুম দেন, তবে আমরা পনেরো বিশজন মালি, চাপরাসি আর ক্লার্ক মিলে গাছের নিচ থেকে মানুষটিকে অনায়াসে বের করতে পারি।

বেশ কিছু ক্লার্ক মালিকে সমর্থন করে একসঙ্গে বলে উঠল: হাঁ, হাঁ, মালি ঠিক বলেছে। আমরা তৈরি, হাত লাগাও।

অনেকে গাছটিকে সরানের অন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল।

সুপারিনটেনডেণ্ট হঠাৎ বাধা দিয়ে বল্লেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি আণ্ডার সেক্রেটারির কাছে একবার জিজ্ঞেস করে আসি।

সুপারিনটেনডেণ্ট আণ্ডার সেক্রেটারির কাছে গেলেন। আণ্ডার সেক্রেটারি ডেপুটি সেক্রেটারির কাছে গেলেন। ডেপুটি সেক্রেটারি জয়েণ্ট সেক্রেটারির কাছে গেলেন। জয়েণ্ট সেক্রেটারি চীফ সেক্রেটারির কাছে গেলেন। চীফ সেক্রেটারি মিনিষ্টারের কাছে গেলেন। মিনিষ্টার চীফ সেক্রেটারিকে কিছু বললেন। চীফ সেক্রেটারি জয়েণ্ট সেক্রেটারিকে কিছু বললেন। ডেপুটি সেক্রেটারি আণ্ডার সেক্রেটারিকে কিছু বললেন। ফাইল চলতে লাগল—এর মধ্যে অর্ধেক দিনও চলে গেল।

দুপুরের লাঞ্চের পর সেই চাপা পড়া মানুষটির চারদিকে আরো ভীড় বেড়ে গেল। নানা মানুষ নানা ধরনের কথা বলতে লাগল। কিছু বিজ্ঞ ক্লার্ক নিজেরাই সমস্যার সমাধান বের করে ফেলল। বিনা হুকুমেই তারা যখন গাছ সরানোর পরিকল্পনা করছে ঠিক তখুনি সুপারিনটেনডেণ্ট ফাইল নিয়ে ছুটতে ছুটতে হাজির হলেন। বল্লেন, আমরা এই গাছ আমাদের খেয়াল খুশিমতো এখান থেকে সরাতে পারব না। কারণ আমরা বাণিজ্য দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত, আর এই গাছ কৃষি দপ্তরের এক্তিয়ারে। আমি এই ফাইল আর্জেণ্ট মার্ক করে এখনই কৃষি দপ্তরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওখান থেকে উত্তর আসার পর আমরা গাছ সরাবো।

দ্বিতীয়দিন কৃষি বিভাগ থেকে উত্তর এলো, এই গাছ বানিজ্য দপ্তরের মধ্যে পড়ছে, সুতরাং এই গাছ বানিজ্য দপ্তরের।

উত্তর পেয়ে বানিজ্য দপ্তর যারপর নাই চটে গেল। তারাও সঙ্গে সঙ্গে কড়া জবাব দিল, এই গাছ সরানো বা না সরানোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব কৃষি দপ্তরের। বানিজ্য দপ্তরের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক সেই।

পরের দিনও ফাইল চলতে আরম্ভ করল! সন্ধার সময় জবাব এল, আমরা এই সমস্যা হটিকালচার ডিপারমেন্টে পাঠালাম। কারণ এ এক ফলদার গাছের ব্যাপার। এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্টে শাকসব্জি ও খেত-খামার সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারে। জাম গাছ ফল দেয়। সুতরাং এই ধরনের ফলদার গাছের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভাবে হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্টেরই অন্তর্গত।

রাত্রে মালি চাপা-পড়া মানুষটিকে ডাল-ভাত খাওয়ালো। তার চারিদিকে পুলিশের কড়া পাহারা বসেছে, কোন মানুষ যেন নিজের হাতে কানুন তুলে নিয়ে গাছ সরানোর চেষ্টা না করে। কিন্তু একজন পুলিশের চাপা-পড়া মানুষটির প্রতি করুণা হয়। সে মালিকে খাওয়ানোর অনুমতি দেয়।

মালি চাপা-পড়া মানুষটিকে বল্ল, তোমার ফাইল চলছে, মনে হচ্ছে কালকের মধ্যে একটি ফয়সলা হয়ে যাবে।

চাপা-পড়া মানুষটি মালির কথার কোন জবাব দেয় না।

মালি গাছটির দিকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে বলল, ভাগ্যিস তোমার কোমরের একদিকে পড়েছে। কোমরের মাঝখানে পড়লে তোমার শিঁরদাঁড়া ভেঙ্গে যেত।

চাপা-পড়া মানুষটি মালির কথার কোন জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে না।

মালি আবার বলল, তোমার যদি কোন ওয়ারিস থাকে তবে আমাকে তার ঠিকানা বল, আমি তাঁকে খবর দেওয়ার চেষ্টা করব।

চাপা-পড়া মানুষটি অনেক কষ্টে মালিকে বলল, আমি নিজেই বেওয়ারিশ।

মালি দুঃখ প্রকাশ করে চলে গেল।

তৃতীয় দিন হর্টিকালচারাল ডিপার্টমেণ্ট খুব কড়া এবং ব্যঙ্গপূর্ণ জবাব দিল।

হর্টিকাচারাল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারি সাহিত্য দরদী বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি সাহিত্যিক ভাষায় লিখলেন, খুব আশ্চর্যের কথা সমগ্র দেশে আমরা বৃক্ষ রোপন করছি, তখনই আমাদের দেশে এমন কী সরকারী আইন আছে যার বৃক্ষ কাটা যায়! একটি জাম বৃক্ষ, যার ফল সবাই আস্বাদন করে। আমাদের বিভাগ কোন মতেই এই ধরনের এক ফলদার বৃক্ষকে কাটার অনুমতি দিতে পারে না।

একজন রসিক মানুষ আফসোস করে বলল, এখন তবে কি করা যায়? যদি গাছ কাটা না হয় তবে মানুষটিকেই কেটে বের করা হোক। সে সবাইকে তার প্রস্তাব বুঝিয়ে দিল, দেখুন যদি মানুষটিকে এখান থেকে কাটা যায় তবে অর্ধেক মানুষ এদিকে বেরিয়ে আসবে, অর্ধেক ঐদিকে। আর গাছটি যেমন আছে তেমন থাকবে।

চাপা-পড়া মানুষটি তার কথায় প্রতিবাদ করে উঠল, কিন্তু আমি যে মারা যাব।

একজন ক্লার্ক বলল, হ্যা, এ কথাও ঠিক।

মানুষটিকে কাটার জন্য যিনি নিপুণ যুক্তি হাজির করছিলেন তিনি তার সঙ্গে বললেন, আপনি জানেন না, আজকাল প্লাষ্টিক সার্জারি কত উন্নতি সাধন করেছে। একে যদি দুখণ্ড করে কেটে বের করা যায় তবে প্লাষ্টিক সার্জারি করে আবার জোড়া লাগানো যাবে। এই বার ফাইল মেডিকেল ডিপার্টমেণ্টে পাঠানো হল। মেডিকেল ডিপার্টমেট সঙ্গে সঙ্গে এ্যাকশন নিল। যেদিন তাদের ডিপার্টমেণ্টে ফাইল পৌছল তার পরদিনই তারা ঐ ডিপার্টমেণ্টের যোগ্যতম প্লাষ্টিক সার্জনের নিকট পাঠিয়ে দিল। সার্জেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চাপা পড়া মানুষটির স্বাস্থ্য, রক্তচাপ, নাড়ির গতি, হার্ট ও মাংস পরিক্ষা করে এক রিপোর্ট লিখলেন। হাঁ, প্লাষ্টিক অপারেশন হতে পারে এবং অপারেশন সফলও হবে, তবে মানুষটি মারা যাবে।

সুতরাং এই ফয়সালা আর গ্রহন করা হল না।

রাত্রে মালি চাপা-পড়া মানুষটিকে খিচুরী খাওয়াতে খাওয়াতে বলল, তোমার ব্যাপারটি ওপর মহলে গিয়েছে। শুনেছি কালকে সেক্রেটারিয়েটের সমস্ত সেক্রেটারিদের মিটিং হবে। ঐ মিটিং-এ তোমার কেস রাখা হবে। মনে হচ্ছে সব ঠিক হয়ে যাবে।

চাপা-পড়া মানুষটি বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে বলল :

জানি আমাকে হয়তো অস্বীকার করবে না
কিন্তু আমার কাছে যখন খবর আসবে
তখন আমি পুড়ে ছাই হয়ে যাব।

মালি আচমকা তার ঠোটে আঙ্গুল রেখে আশ্চর্য কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, তুমি, তুমি, কি কবি?

চাপা-পড়া মানুষটি ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

পরের দিন মালি চাশরাশিকে বলল, চাপরাশি ক্লার্ককে বলল, ক্লার্ক হেড-ক্লার্ককে বলল, কিছুক্ষণের মধ্যে সারা সেক্রেটারিয়েটে খবর রটে গেল, চাপা পড়া মানুষটি একজন কবি। আর দেখতে দেখতে কবিকে দেখার জন্যে লোক ভেঙ্গে পড়ল। এই খবর শহরেও পৌছে গল। আর সন্ধ্যার মধ্যে শহরের অলিগলিতে যত কবি আছেন তারা এসে জমা হলেন। সেক্রেটারিয়েটের লন কবি, কবি তার কবিতে ভরে উঠল। চাপা-পড়া মানুষটির চারিদিকে কবি সম্মেলনের এক সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়ে গেল। সেক্রেটারিয়েটের কয়েকজন ক্লার্ক এবং আণ্ডার সেক্রেটারি—যারা সাহিত্য এবং কবিতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারাও এখানে এসে থেমে গেলেন। কয়েকজন কবি চাপা-পড়া মানুষটিকে তাদের কবিতা এবং দোহা শোনাতে শুরু করলেন। আর কয়েকজন ক্লার্ক তাকে তারা নিজস্ব কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে বললেন।

চাপা-পরা মানুষটি যে একজন কবি, এই খবর যখন সেক্রেটারিয়েটের সব কমিটিতেঁ পৌছল, তখন তারা রায় দিলেন, চাপা-পরা মানুষটি একজন কবি, সুতরাং এ ব্যাপার ফয়সালা করতে হর্টিকালচার বা এগ্রিকালচার

ফতর পারে না। এ সম্পূর্ণভাবে কালচারাল বিভাগের ব্যাপার। [illegible]াল বিভাগকে অনুরোধ করা হল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হতভাগা কবিকে চাপা-পরা ফলদার গাছ থেকে মুক্ত করা হোক।

ফাইল কারচারাল ডিপার্টমেন্টের এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগ ঘুরতে ঘুরতে সাহিত্য একাডেমির সেক্রেটারির হাতে এল। বিচার। সেক্রেটারি ঠিক ঐ সময়েই গাড়িতে করে সেক্রেটারিয়েটে এসে পৌছলেন এবং তিনি চাপা-পড়া মানুষটির ইণ্টারভিউ নিতে শুরু করলেন।

—তুমি কবি?

—সে জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কোন নামে তুমি পরিচিত?

—ওস।

—ওস? সেক্রেটারি বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন। তুমি সেই ওস—যার পদ্য সংগ্রহ ‘ওসের ফুল’ নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে?

চাপা-পড়া মানুষটি রুক্ষ কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ।

সেক্রেটারি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাদের একাডেমির মেম্বার?

—না।

সেক্রেটারি বললেন ঃ আশ্চর্যের কথা। এতো বড় কবি—‘ওসের ফুলে’র লেখক আমাকের একাডেমির সদস্য নয় আহা কি ভুল হয়ে গিয়েছে আমার, কত বড় কবি অথচ কী অন্ধকারের নিচে চাপা পড়ে আছে!

—আজ্ঞে নাম চাপা পড়ে নেই। আমি স্বয়ং এক গাছের নিচে চাপা পড়ে আছি। দয়া করে আমাকে তাড়াতাড়ি মুক্ত করুন।

এক্ষুনি করছি বলে সেক্রেটারি তখনই নিজের দপ্তরে রিপোর্ট করলেন।

পরের দিন সেক্রেটারি ছুটতে ছুটতে কবির কাছে এলেন। বললেন, নমস্কার, মিষ্টি খাওয়াও। আমাদের সাহিত্য একাডেমি তোমাকে কেন্দ্রীয় শাখার সদস্য করে নিয়েছে। এই নাও তোমার সদস্য পত্র।

চাপা-পড়া মানুষটি বেশ কঠোরতার সঙ্গে তাকে বলল ঃ আমাকে তো আগে এই গাছের নিচ থেকে বের করুন।

র ধীরে তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বইছিল। তার চোখ দেখে মনে হচ্ছিল সে খুব কঠিন অসুখ আর দুঃখের মধ্যে পরেছে।

সেক্রেটারি বল্লেন : এ ব্যাপারে আমার বলার কিছুই নেই। আমি যা করতে পারি তা করে দিয়েছি। তুমি যদি মারা যাও তা হলে তোমার স্ত্রীকে পেনশন দিতে পারি। তবে আবেদন করলে তার একটা ব্যবস্থা হতে পারে।

কবি থেমে বলল : আমি বেচে আছি, আমাকে বাচিয়ে রাখুন।

সরকারের সাহিত্য একাডেমির সেক্রেটারি হাত কচলাতে কচলাতে বল্লেন: মুশকিল কি জান, আমার দপ্তর শুধুমাত্র কালচারের সঙ্গে যুক্ত। গাছ কাটা-কাটির ব্যাপার তো আর দোয়াত কলমে হয় না—কুড়ুলকাটারির সঙ্গেই এর গভীর সম্পর্ক। আমি ফরেণ্ট ডিপার্টমেণ্টে আর্জেণ্ট লিখে দিয়েছি। সন্ধ্যার সময় মালি এসে চাপা-পড়া মানুষটিকে বলল, কাল ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের লোক এসে গাছ কেটে দেবে, আর তুমিও বেঁচে যাবে।

মালি খুব খুশি ছিল। চাপা-পড়া মানুষটির শরীরে আর কুলাচ্ছিল না। বাচার জন্যে আপ্রান সে বুঝে চলেছিল। কাল পর্যন্ত ··· কাল ভোর পর্যন্ত, যে কোন ভাবেই হোক কাল ভোর পর্যন্ত বেচে থাকতেই হবে।

পরের দিন ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের মানুষ জন যখন কুড়াল-কাটারি নিয়ে গাছ কাটতে হাজির হল, তখন বৈদেশিক দপ্তর থেকে খবর এল, গাছ কাটা বন্ধ রাখ। কারন দশ বছর আগে পিটোনিয়ায় প্রধানমন্ত্রী সেক্রেটারিয়েটের লনে এই গাছ লাগিয়েছিলেন। এখন যদি এই গাছ কাটা হয় তবে পিটোনিয়া সরকার অসন্তুষ্ট হতে পারেন।

একজন ক্লার্ক চিৎকার করে বলল : কিন্তু এর সাথে একজন মানুষের জীবনের প্রশ্ন যে জড়িত !

আর একজন ক্লার্ক অন্য ক্লার্কটিকে বলল, আরে এদেশের সম্পর্কেও প্রশ্ন। তুমি কি জান না পিটোনিয়া সরকার আমাদের দেশকে কিভাবে সহযোগিতা করছে। আমরা কি বন্ধুত্বের জন্য একজন মানুষের জীবন উৎসর্গ করতে পরি না ?

—কবির মরে যাওয়া উচিত?

—নিশ্চয়ই।

আবার সেক্রেটারি সুপারিনডেন্টকে বললেন, আজ প্রধানমন্ত্রী সফর শেষ করে ফিরেছেন! বিকেল চারটায় বৈদেশিক দপ্তর এই গাছ সম্পর্কিত ফাইল তাঁর কাছে পেশ করবেন। উনি যা বলবেন তাই হবে।

বিকেল পাঁচটায় সেক্রেটারি স্বয়ং ফাইল নিয়ে হাজির হলেন।

এই যে শুনছো। খুশিতে গদগদ হয়ে তিনি ফাইল দোলাতে দোলাতে বললেন, প্রধানমন্ত্রী এই গাছ কাটার হুকুম দিয়েছেন। সমস্ত আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছেন। কালই এই গাছ কাটা হবে। আর তুমিও এই সমস্যা থেকে বেঁচে যাবে। আরে শুনছো কী? আজ তোমার ফাইল পুর্ণ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু কবির হাত ছিল বরফের মতো ঠাণ্ডা। চোখের তারা স্থির। একসার পিঁপড়ে তার মুখের ভিতর ঢুকছিল।

তার জীবনের ফাইলও তখন পুর্ণ হয়ে গিয়েছে।

—০—

ডি. এইচ. লরেন্স-এর

বহু আলোচিত গ্রন্থ ঃ

লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার

প্রকাশিত হয়েছে।

১৮ বছরের নিচে যাদের বয়স তারা বইটি পড়বেন না। বইটি নিয়ে সংঘটিত হয়েছিল আলোড়ন সৃষ্টিকারী মামলা। বইটিকে কেউ বলেছেন অশ্লীল, কেউ বিচার করেছেন শৈল্পিক দিক্ দিয়ে। নায়ক নায়িকার অবৈধ মিলনের এরকম খোলাখুলি বর্ণনা অন্য কোন বইতে আছে বলে মনে হয় না। তবু প্রমানিত হয়েছে এটা সাহিত্য, সেরা সাহিত্য। পৃথিবীর বেশ কটি দেশে বইটির মুল সংস্করণ নিষিদ্ধ হয়েছিল।

* * *

সহসা প্রকাশিত হচ্ছে ঃ

প্যাট্রিসিয়া রবিন্স-এর

লেডি চ্যাটার্লি'র মেয়ে

ডি. এইচ. লরেন্সের লেডি চ্যাটার্লির পরবর্তী জীবন ও অবৈধ প্রনয়ের জন্ম তার কন্যাকে নিয়ে এই উপন্যাস এক নিঃশ্বাসে পড়ার মত।